মায়াবতীর পথে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক সম্পাদিত

প্রকাশক : শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থ লিখন : ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৬
লিপিকার : শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল
অনুলিপিকার : কুমারী মীরা সরকার
গ্রন্থ প্রকাশন : ২০শে আশ্বিন, ১৩৬০

মূল্য : এক টাকা।

উৎসর্গ

আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদের

নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি

ব্রহ্মচারী

শ্রীপ্রাণেশকুমারকে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

প্রকাশকের নিবেদন

এই পুস্তক প্রকাশনায় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র গুহ মহাশয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

২০শে আশ্বিন, ১৩৬০। শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

বইখানি মায়াবতী, সুখীডাং ও চম্পাবতীর চিত্র-বর্ণনা। সুপরিচিত গ্রন্থকারের পূর্বপ্রকাশিত "ব্রজধাম দর্শন" ও "বদরীনারায়ণের পথে" যে বর্ণনা পাই তাহাতে স্থানবিশেষে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। ব্রজধাম, শ্রীধামে উদার উন্মুক্ত মাঠ-ঘাট, ফল-ফুল—জল পাতা—গাছ ঘাস যেন সমস্তই লীলাময়ী; সবুজ-ঘন শ্যাম শোভায় সব নয়নাভিরাম! এখানে উৎসব আনন্দে, ছন্দে গীতে মনে একটা মাধুর্য ও লীলাভিনয়ের ভাব জাগাইয়া দেয়। আবার বদরীনারায়ণের পথের বর্ণনায় দেখি—সেই আকাশছোঁয়া স্তব্ধ বিরাট পাহাড়ের সারি, মনকে কোন এক প্রশান্ত ধ্যান-গম্ভীর রাজ্যে লইয়া চলিয়া যায়। মায়াবতীর বর্ণনা অন্যরূপ। সবুজ কোমল তরল শ্যাওলায় ঢাকা নীল পাহাড়ের গা···উপরে আকাশের বুকে সিঁদুর-রাঙা সূর্যের শোভা···আশে-পাশে স্বচ্ছ সাবলীল নদীধারার চাকচিক্য···দূরে বহুদূরে সবুজ বনানী, তার ফাঁকে ফাঁকে চালাঘর এক অপূর্ব সৌন্দর্য-রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে। দেবদারু, ঝাউ, কেলুর সে এক মনোরম দৃশ্য!

ইহা ছাড়া গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও মাঝে মাঝে ছোঁয়াচ দিয়েছেন। ঝাউগাছের আঠা হইতে কিভাবে ধুনা প্রস্তত হয়, পাথরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তর-স্তরের সমাবেশ, এসবও উল্লেখ করেছেন—সাদা চূণে পাথর, বেলে পাথর, বাদামী পাথর ও শ্লেট পাথর। স্থান কাল ও আবেষ্টনী হিসাবে সমতল, মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে শরীর-মনের গঠন ও পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হয় তারও পরিচয় দিয়েছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন ফল ফুল ও বিভিন্ন উদ্ভিদসমূহ উপযুক্ত আহার্য ও সারের

সাহায্যে কিরূপে সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করিয়াছে ও ফলফুলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারও উল্লেখ আছে। এই সমস্ত বস্তু বৈজ্ঞানিকদের ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দের বিশেষ গবেষণার বিষয়।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান অনুরাগী বিরজানন্দ স্বামী, তাঁহার স্নেহভাজন ও অন্তরঙ্গ ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার এবং জয়পুর শিল্প-বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ (ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে মহাশয়, এঁদেরও কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটি কথা, শ্রদ্ধেয়া মাদার সেভিয়ারের অন্তরে যে একটি পরদুঃখ-কাতর প্রাণ ছিল, সকলের দুঃখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিত, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও অপরকে সাহায্য করিত, এই লেখার মধ্যে সেই প্রাণের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

মায়াবতীর আর একটি দৃশ্য—একটি পাহাড়···তিনটি বিভিন্ন অংশ··· নীচে, মধ্যে ও উপরে। নীচের অংশটি যেন একটি সিংহ, উপরের অংশটি পার্বতী মূর্তি; মধ্যিখান দিয়া দুইটি ঝরনা বহিয়া চলিয়াছে—যেন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ভগবতীর অন্তরের স্নেহধারা বিগলিত হইয়া স্তন বাহিয়া অঝোর ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

মহালয়া

২০শে আশ্বিন, ১৩৬০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক

মায়াবতীর পথে

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে (বাংলা ১৩২১ সালে) হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে যাই। কনখলে সেবাশ্রমে দিনকতক থাকিয়া ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার ও আমি মায়াবতীতে যাইতে মনস্থ করিলাম।

পিলিভিত

কয়েকদিন পরে আমরা হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া বেরিলীতে আসিলাম এবং তথা হইতে গাড়ী বদল করিয়া পিলিভিতে (Pilibhit) যাইলাম। সময়টা অতি গরম, 'লু' চলিতেছিল। এজন্য বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। পিলিভিত হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমরা ছোট লাইন দিয়া টনকপুরের জঙ্গলে চলিলাম। জঙ্গলের ভিতর কয়েকটি রেল স্টেশন আছে। জঙ্গলে বুনোহাতী ও বাঘের ভয় থাকায় স্টেশনের বাড়ীগুলি দোতলায়। একটা বড় খিলান করিয়া তাহার উপর দোতলা ঘর করিয়াছে; উঠিবার জন্য পাশ দিয়া একটা সিঁড়িমাত্র। স্টেশনে কাজ করিয়া লোকগুলি উপরকার ঘরটিতে গিয়া থাকে, চাকরীর খাতিরে বনজঙ্গলের মধ্যে বাস করে এবং আহারাদির জিনিসপত্র দূর হইতে আনাইয়া লয়।

বন-বাসা ও ভাপুর

স্টেশনের একটির নাম মনে আছে, 'বন-বাসা'। ট্রেনে যাইতে যাইতে নামটি পড়িয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, ঠিকই নাম বটে। বনেতে কুশ-ঘাসের খুব কারবার। এইখানে দেখিলাম কুশ-ঘাস এক মানুষের উপর লম্বা (Tiger grass), ইহাতে বাঘ লুকাইয়া থাকে। এই ঘাসে অন্যত্র কুশাসন তৈয়ারি হয়। এই কুশ হইতে কুশাসন ও জানালা-দরজার পর্দা প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু তৈয়ারি হয়। পশ্চিমে ইহা একটি বড় ব্যবসা। এই জঙ্গলে বিশেষ ব্যবসা হইল কাঠের কাজ। এইজন্য শীতকাল হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্যন্ত স্থানটিতে অনেক কারবারী বাস করে। গরম পড়িলে ও বর্ষা হইলে শহরে কেহই থাকে না। পাহাড়ীরা এই স্থানটিকে 'ভাপুর' (Vapour) বলে। বাংলায় 'ভাপরা' (Vapour)—গরমস্থান। এই স্থানটি হইল সরযূ নদীর দক্ষিণ দিকে। সরযুর অপর দিক হইল পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল—মাঝখান দিয়া সরযূ নদী যাইতেছে। বুনোহাতী ও বাঘের বড় ভয় আছে।

টনকপুর

প্রাণেশ কুমার ও আমি সন্ধ্যার কিছু আগে টনকপুর পৌঁছাইলাম। তখনও সামান্য বেলা আছে, কিন্তু রাস্তায় কোন লোকজন দেখিলাম না। ভাগ্যক্রমে একটি লোককে

পাওয়া গেল। সে বলিল যে, সেখানে থাকিবার অন্য কোন স্থান নাই, শিবের ভাঙা মন্দিরে থাকিতে পাওয়া যায়। আমরা অগত্যা সেইদিকে চলিলাম। ঐ বাড়ীটির পাঁচিলও নাই, পাতকূয়াও নাই। উঠানের মাঝে চাতালে আমাদের বিছানা রাখিয়া দুইজনে বসিয়া পড়িলাম। এদিকে অন্ধকার হইয়া গেল। তেষ্টায় জিভ শুকাইয়া গিয়াছে, একটু জল খাওয়া চাই।

শিবমন্দির

আমি তো লোটা লইয়া একটা রাস্তা ধরিয়া অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে চলিলাম; কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, বাঘেরও খুব ভয় রহিয়াছে। সিধে খানিকটা যাইয়া নদীর জলের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, সেই আওয়াজ অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে কতকগুলি কড়িকাঠের মত বাহাদুরী কাঠেতে পা ঠুকিয়া যাইল। সেই কাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া দেখিলাম যে, জল রহিয়াছে। আমি তো কোনরকম করিয়া জিভ ও দাঁত মাজিয়া ঢোকে ঢোকে জল খাইতে লাগিলাম। জিভ ও গলার নলী এমন শুকাইয়া গিয়াছে যে, জল প্রবেশ করে না। যা'হোক, জল খাইয়া এক লোটা জল লইয়া শিবের মন্দিরে আসিলাম। প্রাণেশ সেই পথ ধরিয়া মুখ ধুইতে যাইল। তারপর দুইজনে বিছানায় ঠেস দিয়া অন্ধকারে সেই চাতালের উপর বসিয়া আছি, কি করিব

ঠিক করিতে পারিতেছি না। এইরূপ খানিকক্ষণ থাকিবার পর দেখিলাম যে, সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীর একদিকে একটি ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আমি তো অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে অজানা বাড়ীর উঁচু নীচু ঠিক করিয়া সেই ঘরটির দিকে যাইলাম; দেখিলাম, একটি যুবক শিব পূজা করিতেছে। আমি আশ্বস্ত হইলাম; যা'হোক, মানুষ দেখিতে পাওয়া গেল। আমি শিবকে প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যুবকটি বাহিরে আসিল, আমি তাহার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় সে আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তির আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিল। তখন তো তাহাকে খুব বকিতে লাগিলাম—এই বলিয়া যে, সে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করে নাই কেন? সে তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার এক বৃদ্ধা মাসীকে ডাকিয়া আনিল। বৃদ্ধার মুখের চেহারা হইতেছে—একখানা বারকোসে ফুটা করিয়া দিলে যাহা হয়, ছোট ছেলেরা দেখিলে ডরাইয়া উঠে। ভাষা তো কিছুই বুঝি না, কেবল মাথাটা উপর নীচে নাড়াইতে লাগিলাম। আমরা আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইলাম যে, আমাদের খাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিক। সে একটা আলো আনিল এবং গাছের কাঠির তৈয়ারি একপ্রকার ঝাড়ু আনিয়া একটা দালান পরিষ্কার করিয়া দিল। সেখানে আমরা বিছানা পাতিয়া বসিলাম। সুমুখে কিছু কাঠ আনিয়া একটা আগুন করিয়া দিল। প্রাণেশ কিছু পয়সা দেওয়ায় বৃদ্ধা আমাদের খিচুড়ি

রাঁধিয়া খাইতে দিল। যা'হো :, এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় আমরা কিছু খাইতে ও থাকিবার জায়গা পাওয়ায় পরম আনন্দিত হইলাম।

পরদিন বৃদ্ধার বাড়ীতে খাইয়া মুটে ডাকিয়া জিনিসপত্র লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং বেলা বারোটার সময় প্রচণ্ড রৌদ্রে আমরা জঙ্গল দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই জঙ্গল হইল সরযূর কিনারা দিয়া; ওপারে নেপাল পাহাড়। বর্ষার জল যখন বেশী হয় তখন এ পথ দিয়া আর চলা যায় না। নদীর জল নামিয়া গেলে গাছের তলা দিয়া বেশ যাওয়া যায়।

সমতা-সাধন বিধি

কিছুদূর যাইয়া দেখি যে, পালে পালে গরু চরিতেছে। অন্য জায়গায় গরুর শিং নানা ভাবের হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্টতা নাই। কিন্তু এস্থানের গরুর শিং দেখিলাম যে, কপালে যেন একটা সমকোণ (Right angle) হইয়াছে। অর্থাৎ কপালের সামনের খুলি হইতে যেন দুইটি ধারাল খোঁচা বাহির হইয়াছে। এইখানে বাঘের ভয় থাকায় গরুর শিং এইভাবে সৃজিত হইয়াছে। গরু শিং দিয়া যেন বাঘের বুকে খোঁচা মারিতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য শিং দুটির স্থিতি ও আকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। 'জীববিদ্যা'য় (Biology) ইহাকে 'সমতা-সাধন-বিধি' * (Law of concordance)

* আবেষ্টনী ও জলবায়ু অনুসারে স্নায়ুপুঞ্জস্থিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয় এবং অবয়ব পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। সঃ

বলে। শিং-এর এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। হিমালয় পর্বতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনেক শিখিবার আছে। সেইজন্য এই কথা উল্লেখ করিলাম।

কাঁকড়

খানিকটা গিয়াছি, নিকটস্থ ঝোপজঙ্গলের মধ্য হইতে একটা আওয়াজ আসিতে লাগিল, অনেকটা কুকুরের মত। আমরা যত যাই, জন্তুর আওয়াজও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। আমাদের বড় ভয় হইল, যেন কোন শ্রেণীর বাঘ আমাদের অনুসরণ করিতেছে। পরে পাহাড়ীদের জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, এক শ্রেণীর হরিণের আওয়াজ। পাহাড়ীরা ইহাকে 'কাঁকড়' (Barking deer) বলে। অবয়ব ছোট, কিন্তু বড় শীঘ্র ঝোপের ভিতর চলিয়া যায়; খুব নিকট হইতে আওয়াজ করিতেছে; কিন্তু কখনও চেহারা দেখিতে পাই নাই। এই জাতীয় হরিণ অন্য দেশে কখনও লক্ষ্য করি নাই। এইস্থানে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ঝিঁ ঝিঁ পোকা

আমরা দুইজনে দুপুর বেলায় জঙ্গল দিয়া যাইতেছি, রৌদ্র প্রচণ্ড হইতে লাগিল; এমন সময় শুনি একপ্রকার 'কিট্ কিট্' আওয়াজ সমস্ত বনটাকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। কানটাকে যেন কালা করিয়া দিতেছে, ঠিক যেন বড় জানোয়ারের ভীষণ আওয়াজ। পরে পাহাড়ীদের জিজ্ঞাসা

করায় তাহারা একটা পোকা আনিল, পোকাটি কালোপানা. এক ইঞ্চি পরিমাণ। আমরা যাকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা (Cricket) বলি, সেই জাতীয়। পোকাটার সুমুখে দুইটি শুঁড় (Prong) আছে। এই শুঁড়ে করাতের মতন কিরকিরে দাগ আছে। দুইটি শুঁড়েতে পরস্পর ঘসে আর ভীষণ আওয়াজ হয়। এই পোকাটা আমি এই স্থানে দেখিয়াছি, অন্যত্র লক্ষ্যে পড়ে নাই। এজন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক বিষয় শিখিতে হইলে এই হিমালয় একটি বিশিষ্ট স্থান। কারণ, বহু প্রকারের প্রাকৃতিক বস্তু অদ্যাপি এইস্থানে সংরক্ষিত আছে।

গোঠ ও গুর্জর

আমরা দুইজনে বন দিয়া যাইতেছি, খানিক পরে দেখিলাম, 'গোঠ' রহিয়াছে। কৃষ্ণের গানেতে 'গোঠে' 'মাঠে' অনেক শোনা যায়, কিন্তু 'গোঠ' কাহাকে বলে পূর্বে দেখি নাই। কুশ-ঘাস দিয়া ও গাছের ডাল দিয়া একপ্রকার টানা 'ঝুবড়ী' করে; একপ্রকার কুশ-ঘাসের খ'ড়ো ঘর। সংস্কৃতে এক শব্দ আছে, 'উটজ' অর্থাৎ খড়ের ঘর। পর্ণকুটীর হইল অন্য প্রকার। এই 'গোঠ' নদীর এপারেও আছে এবং সরযূর ওপারে—নেপালের পাহাড়েও আছে। এই গোঠে 'গুর্জর' নামে একশ্রেণীর লোক বাস করে। 'গুর্জর' গোচারকের অপভ্রংশ শব্দ। গুর্জররা অনেকেই মুসলমান এবং হিন্দুও

অল্পসংখ্যক আছে। এই গুর্জর শ্রেণীর লোক কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত পাহাড় অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ঘাস, গরু চরাইবার সুবিধা, গুর্জরেরা সেইখানেই থাকে। এ অঞ্চলের গুর্জরেরা গরমকালে গরু-বাছুর লইয়া পাহাড়ে চলিয়া যায় এবং শীতকালে টনকপুরের জঙ্গলে ফিরিয়া আসে। আলমোড়ার অনেক জায়গায় শীতকালে পাহাড়ীদেশের ঠাণ্ডায় পাহাড়ে থাকা অসহ্য হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত কম শীত টনকপুরে চলিয়া আসে এবং এইরূপ কুশ-ঘাসের ঘর করিয়া কয়েক মাস বাস করে। এই গুর্জরদের সম্পত্তি হইল—গরু, বাছুর, নিজেদের রাঁধিবার হাঁড়ি, খানকতক কম্বল এবং দুই একটি কুকুর। এই জাতীয় লোকেদের দেখিলাম, কি সুস্থ শরীর! খুব লম্বা চওড়া মোটা মোটা হাড়; সর্বদা রৌদ্রে থাকায় রং ঈষৎ মলিন; যেন একখানা পাথর কুড়াইয়া মানুষ তৈয়ারি করিয়াছে। এইরূপ সুস্থ ও বলিষ্ঠকায় লোক ভারতবর্ষের নগরে বা গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের স্ত্রীলোকদের দেখিলাম কি লম্বা চওড়া সুদৃঢ় তনু! * তবে নগরবাসীর ন্যায় ইহারা চটপটে ও বুদ্ধিমান নহে। বোকা, ভালমানুষ, চুরি ডাকাতি করে না।

আর একটা দেখিলাম—বাঘের সঙ্গে এক জঙ্গলে বাস

---

* প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অনুযায়ী মন ও শরীর গঠন হইয়া থাকে। পার্বত্য, মরু ও সমতল অঞ্চলের আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। গ্রন্থকারের "Natural Religion" পুস্তক দ্রষ্টব্য। সঃ

করায় ইহারা বাঘকে কিছুমাত্র ভয় করে না। একটি বাঁশের খেঁটে লইয়া একটি গুর্জর স্ত্রীলোক বাঘকে তাড়া করিয়া গেল। বাঘকে যেন ইহারা শিয়াল কুকুরের মত বোধ করে। পথে যাইতে যাইতে একবার একদল গুর্জরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে গাছের ছায়া ও ঝরনা পাওয়ায় আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাঁধিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। গুর্জর এক পুরুষ একটি বড় হাণ্ডাতে গরুর দুধ দুইল। একটা মোটা ঘোল-মউনি দড়ি দিয়া গাছের ডালে বাঁধিয়া উহা মইতে লাগিল।

সাধারণ গয়লারা ঘোল-মউনি ছোট করে এবং ধীরে ধীরে উহা ঘুরায়। কিন্তু গুর্জরদের দেখিলাম সেই মোটা ঘোল-মউনি তাড়াতাড়ি ঘুরাইল। ঠাণ্ডাদেশ—মাখন তাড়াতাড়ি উঠিল। সেই মাখন একটা পাত্রে রাখিল। বাকি যে দুধ রহিল তাহা সকলে একবাটি একবাটি খাইল। তারপর মোটা মোটা রুটি দিয়া অবশিষ্ট দুধটুকু খাইয়া লইল। দেখিলাম, সাধারণতঃ ইহারা নুনের জিনিস খায় না—দুধ আর রুটি খায়—ফাঁকা হাওয়ায় পড়িয়া থাকে। এইজন্য ইহাদের শরীর এত বলিষ্ঠ। শরীরের সুস্থতা ও দৃঢ় অবস্থা দেখিতে হইলে এখনও গুর্জরদের দেখা উচিত। সম্ভবতঃ গ্রীক্‌রা এইরূপ এক গুর্জরকে তাহাদের 'হারকিউলিস্' (Hercules) দেবতা নির্মাণ করিয়াছিল। গুর্জররা হইল এখনকার যুগের 'হারকিউলিস্'।

সুবেদারনী

পথে যাইতে যাইতে মায়াবতীর আশ্রমের ভক্ত, একদল গুর্খার সহিত আমাদের দেখা হইল; দুইটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের ছেলেমেয়ে। একটি বৃদ্ধা হইলেন সুবেদারের পত্নী, এইজন্য তাহাকে সুবেদারনী বলিতাম। তাহার নাম সরস্বতী, হিন্দী গ্রন্থাদি তাহার বিশেষভাবে পড়া ছিল, সংস্কৃতও কিছু জানিত,—একজন পাহাড়ী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক। একদিন কথাপ্রসঙ্গে সুবেদারনী বলিতে লাগিল যে, তাহাদের ছেলেদের নয় বছর বয়স হইলেই গুর্জরদের গোঠে পাঠাইয়া দেয়। গুর্খার ছেলেরা এইরূপে জঙ্গলে, মাঠে ও পাহাড়ে খুব ছুটাছুটি করে, পেট ভরিয়া দুধ খায়, পাহাড় হইতে লাফায় ও বাঘের সঙ্গে লড়াই করে। তাহাতে তাহাদের শরীর ভাল হয়। আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম,—"অ সুবেদারনী মায়ি, তোমাদের ছেলেদের কি গুরুগৃহে পাঠিয়ে দেও?" সুবেদারনী হাসিয়া বলিল—"আমরা ছেত্রি, আমাদের ছেলেরা সাহসী হবে ও লড়াই করবে। এইজন্য ইহাদের সাহসী ও তাগড়া করিয়া থাকি। তারপর বার-চৌদ্দ বৎসর হইলে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই, উপনয়ন দেই ও ঘরের কাজকর্ম করাই। আমাদের ছেলেরা তো বাঙ্গালীদের মত কেরানী হবে না, এরা সেপাই হবে। এইজন্য আগে থেকেই এদের সাহসী ও বলিষ্ঠ করি।" আমি বলিলাম,— "অপর জাতের ছোঁয়া রুটি যে খেয়েছে?" সুবেদারনী অমনি

উত্তর করিল যে, রণক্ষেত্রে সব বস্তু পবিত্র, অপরের রুটি খেলে কোন দোষ হয় না; গুর্জরের গোঠ একপ্রকার রণক্ষেত্র। ইহাতে কোন দোষ হয় না। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম. এ তো বেশ বিধান। ইহারা সেপাই, নিজেদের সুবিধামত বেশ বিধান করিয়া লইয়াছে।

বনবিড়াল

ব্রহ্মচারী প্রাণেশ ও আমি জঙ্গল দিয়া যাইতেছি, বাঘের ভয়েতে গা ছমছম করিতেছে, এমন সময় দেখিলাম, একটা মাঝারি জানোয়ার দৌড়াইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। সিধাভাবে দেখাতে, সেটা কত লম্বা-চওড়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমরা ভয় পাইলাম। আমাদের কিছু তফাতে সেই জানোয়ারটা প্রাণভয়ে একটা গাছেতে উঠিয়া গেল, তখন দেখিলাম বনবিড়াল। বনবিড়াল গ্রাম্য বিড়াল নয়। ইহা একপ্রকার ছোট বাঘ। ছাগলের বাচ্ছা লইয়া যাইতে পারে এবং মানুষকেও কামাড়াইতে পারে। বর্ধমান অঞ্চলে ইহাকে 'হুবার' বলে বা আধাবাঘ বলে। যাহা হউক, এই পশু অতি তীব্র প্রকৃতির। টনকপুরের জঙ্গলে প্রথম বনবিড়াল দেখিলাম।

কলাগাছ

পাহাড় অঞ্চলে দেখিলাম যে, পাহাড়ের 'খড্' বা উপত্যকার গায়ে কলাগাছ হইয়াছে। নিম্ন দেশের হাওয়া না

পাওয়ায় সুপারি গাছের মত লম্বা ও সরু হইয়া অনেক উপরে উঠিয়া পাতা ফেলিয়াছে। বাংলাদেশের মাঠে কলাগাছ মোটা ও অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি হয়, কিন্তু এই উপত্যকার কলাগাছ সুপারি গাছের মতন। হইয়াছে সাধারণ লোকের এই বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য হইবে না, কিন্তু যাঁহারা উদ্ভিদ শাস্ত্র (Botany) অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকরণ—কেন বৃক্ষাদি অবয়ব পরিবর্তন করে, এবং একশ্রেণীর বৃক্ষ হইতে অপর শ্রেণীর বৃক্ষে পরিণত হয়? এইজন্য এই কলাগাছের উল্লেখ করিলাম।

রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, আমি ও প্রাণেশ দুইজন জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, গা ছমছম করিতেছে; কখন বাঘ জঙ্গল হইতে আসিয়া পড়ে। এইরূপে যাইতে যাইতে গুটিকতক পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, তাহারা হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় স্নান করিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া আসিতেছে এবং এইরূপে পাহাড়ের উপর দিয়া নেপালে চলিয়া যাইবে। একবার কনখলে শীতকালে জনকতক পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা বলিল, যে, নেপাল হইতে পাহাড় দিয়া তাহারা কনখলে আসিয়াছে। যাহা হউক, পাহাড়ীরা এরূপ দুর্গম রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

সুখীভাং

রৌদ্র প্রখর হওয়ায় ও অনেক মাইল হাঁটিয়া যাওয়ায়

আমার সর্দিগর্মি হইল। এদিকে ।মতল জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের জঙ্গল ধরিতে হইল, একটুমাত্র জল নাই…জঙ্গল নিবিড়…আমি খানিকটা যাইয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রাণেশেরও সমান কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমার সর্দিগর্মির অবস্থা দেখিয়া সে নিজের কষ্ট তুচ্ছ করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিত, পাছে আমি পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাই। এইরূপে একবার চলি, একবার পড়িয়া যাই; এই-রূপ অবস্থায় চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় সুখীডাং আসিয়া পৌঁছাইলাম। 'সুখীডাং' অর্থ হইল শুকনা ডাঙ্গা…জল নাই। সামান্য একখানি গ্রাম আছে; গ্রামবাসীরা অনেক দূর হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্যামলাতল

আমরা দুইজনে এস্থানে খানিকক্ষণ থাকিয়া একটি পাহাড়ীকে সঙ্গে লইয়া বিরজানন্দের * আশ্রম শ্যামলাতলের দিকে চলিলাম। অন্ধকার নিবিড় হইল, জঙ্গল অতিশয় ঘন, পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে হয়, বাঘের বড় ভয়। সুখীডাং হইতে শ্যামলাতল প্রায় দুই মাইল হইবে। আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম। খানিকটা চলিতে চলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইলাম; প্রাণেশ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আমাকে দুই হাতে ধরিয়া রাখিল, পাছে আমি গড়াইয়া পাহাড় হইতে

---

* কালীকৃষ্ণ মহারাজ।

পড়িয়া যাই। একটু জ্ঞান আসিলে আমি অতি বিনীতভাবে প্রাণেশকে অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, সে আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছে। সেদিন প্রাণেশ আমায় রক্ষা না করিলে সম্ভবতঃ আমার মৃত্যু হইত। এইরূপে যাইতে যাইতে অবশেষে শ্যামলাতলে উপস্থিত হইলাম। নীচু পাহাড় হইতে উপরে উঠিলে বিরজানন্দ আমাকে আহ্লাদে জাপটাইয়া ধরিল। আমি দুই একটা কথা কহিয়াই মাটিতে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। বিরজানন্দ খানকতক কম্বল আনিয়া আমার উপর চাপা দিল। আমি এইরূপে ঘণ্টাখানেক নিদ্রা যাইবার পর বেশ সুস্থ হইলাম। তারপর উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিরজানন্দের সহিত চা খাইতে লাগিলাম। তখন বিরজানন্দের আশ্রম নির্মাণ হইতেছিল, এইজন্য সামনে চাষাদের ঘরে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। পাশাপাশি শুইয়া কম্বল মুড়ি দিয়া কোনরকমে রাত্রিটা কাটানো; কারণ এস্থানে শীত বেশ রহিয়াছে।

গৃহনির্মাণ-প্রথা

পাহাড়ীদের বাড়ী নির্মাণের প্রথা হইল—ভূমি হইতে অর্ধতালা কতকগুলি ঘর করে। এই সকল নীচেকার ঘরে তাহাদের জিনিসপত্র খড়, কুটি, গরু প্রভৃতি সব রাখে এবং রাঁধিবার জায়গাও এই নীচেকার তলায় করে; একটা সিঁড়ি দিয়া এই আধতলার উপর উঠিলে থাকিবার কতকগুলি ঘর

পাওয়া যায়। এইগুলি হইল বড় ঘর; এখানে তাহারা বাস করে। ঘরের ছাদগুলি অনেক সময় শ্লেট (Slate) পাথর দিয়া করে, কখনও বা তক্তা দিয়াও করিয়া থাকে; ছাদটা দুইচালি—জল শীঘ্র শীঘ্র গড়াইয়া যাইতে পারে। এই হইল সাধারণতঃ এই দেশের বাড়ী নির্মাণের প্রথা। এই নিয়ম আমি এই অঞ্চলের সব জায়গায় দেখিলাম। বিরজানন্দের আশ্রম-বাড়ীও এই প্রকারে তৈয়ারি হইয়াছিল।

বিরজানন্দ মহারাজের আশ্রম

বিরজানন্দের আশ্রমের সম্মুখে একটু উঠানের মতন জমি আছে; সেইখানে গোটাকতক ফুলগাছ দিয়াছিল। পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে একখানা বড় পাথর ছিল, আমি সেই পাথরের পাশে বসিয়া 'খড্' দেখিতাম—অতি সুন্দর দৃশ্য! উঠানের দক্ষিণদিকে একটা টিলা বা উঁচু পাহাড় পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের গায়ে একটা রঙ্গীন কাপড়ের নিশান বাঁধা, যেন আগন্তুক ব্যক্তি এই নিশান দেখিয়া আশ্রমে আসিতে পারে। আমি এই পাহাড়ে গিয়া একদিন বসিয়াছিলাম। এই উচ্চস্থান হইতে অনেকদূর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং স্নিগ্ধ শীতল বায়ু সর্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। উঠানের পশ্চিমদিক দিয়া উতরাই করিলে একটা জঙ্গল ও তাহার পাদদেশে একটা পুকুর আছে। এই পুকুরটাকে শ্যামলাতল বলে। শ্যামলাতলাও বা পুকুর, এইজন্য এই স্থানটার এরূপ নাম হইয়াছে। বিরজানন্দ

বলিল যে, ঐ পুকুরটাতে মাগুর মাছ আছে। প্রাণেশ তো এক বঁড়শি ও সুতা লইয়া মাছ ধরিতে যাইল। আমিও সঙ্গে চলিলাম। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমি প্রাণেশকে বলিলাম, "মাছ ধরবে কি? পিছন দিক থেকে বাঘে ধরবে।" তারপর আমরা উপরে চলিয়া আসিলাম। বিরজানন্দের এক পাহাড়ী চাকর দশটার ভিতর খাইয়া একটা ঝোড়া ও জিনিস কিনিবার পয়সা লইয়া পাহাড়ের গা দিয়া টনকপুরে বাজার করিতে চলিল। আমি বলিলাম যে, পাহাড়ের গা ও জঙ্গল দিয়া যাইলে বাঘে ধরিতে পারে। পাহাড়ী হাসিয়া বলিল— "হাতে যে, টাঙ্গি আছে, বাঘকে কিছু ভয় করি না।" পাহাড়ী টনকপুর হইতে বাজার করিয়া চারটার সময় ফিরিয়া আসিল। আমাদের তো সমস্তই আশ্চর্য বোধ হইল। পাহাড়ীদের পাহাড়ের উপর দিয়া কি চলিবার প্রথা! শুধু তাই নয়, তাঁহারা বাঘকে কিছুমাত্র ভয় করে না।

বিরজানন্দ নিজে খুব ভাল রসুইয়ে, এইজন্য পাহাড়ী চাকররা বাঙ্গালীর মত রাঁধিতে শিখিয়াছে। আমরা দিনের বেলা ভাত, ডাল ও মোচার ঘণ্ট খাইলাম; রাত্রে রুটি, ডাল ও আলুর দম খাইলাম। বিরজানন্দ এত সুদক্ষ লোক যে, পাহাড়ের উপর বাঙ্গালী খাওয়া খাইতে দিয়াছিল। সে পাহাড়ীদেরও বাঙ্গালী রান্না শিখাইয়াছিল। এইরূপে এক-রাত্রি ও পরদিন থাকিয়া তৃতীয় দিনও আহার করিয়া আমরা পুনরায় সুখীডাংএর দিকে চলিলাম। দিনের বেলায় দেখিলাম,

জঙ্গল এত ঘন নিবিড় যে, দুপুরবেলা রৌদ্র নামে না। এই জঙ্গলের পাহাড় ও পাহাড়ের গা দিয়া অবশেষে সুখীডাং-এ আসিলাম। দেখিলাম, এই জঙ্গল আদিম ও প্রাথমিক। বাঘ ও হিংস্র জন্তুর বিশেষ প্রিয় আবাসভূমি। এইস্থানে সাধারণ লোকের থাকা একটু চিন্তার বিষয়; কারণ বাঘের গর্জন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তর-তত্ত্ব

আমরা সুখীডাং হইতে দেউড়ীর দিকে চলিলাম। প্রাণেশ ও আমি দুইজনে চলিতেছি, বেলাও বাড়িতে লাগিল এবং রৌদ্রেরও বেশ তেজ হইয়া উঠিল। আমরা ক্লান্ত দুই ব্যক্তি মনকে অন্যত্র রাখিবার জন্য নানাশ্রেণীর প্রস্তর পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রস্তরসকল স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। কোন স্তরে দেখিলাম সাদা চুনের পাথর (Soft limestone), কোন স্তরে দেখিলাম শ্লেট (Slate) পাথর, অন্যস্তরে মাকড়া রংয়ের বেলে পাথর (Brown sandstone) এবং ঈষৎ কালো রংয়ের বেলে পাথর, ইত্যাদি। অনেক রকমের পাথরের স্তর পরীক্ষা করিতে করিতে আমরা চলিলাম। এজন্য কষ্ট তত বোধ হইল না। বৈজ্ঞানিক মতে এই সকল প্রস্তর পরীক্ষা ও নির্ণয় করা একটা বিশেষ কার্য। এই সকল বিষয় কিছু পরিমাণে আমি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে দিয়াছি। এইজন্য এস্থলে আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ

করিতেছি না। যাহা হউক, প্রস্তর-তত্ত্ব যাঁহারা অনুশীলন করিতে চান, এই হিমালয় প্রদেশ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেক বিষয় আমি এইস্থান হইতে শিখিয়াছিলাম।

প্রাকৃতিক ফল-ফুলের পরিবর্তন

পাহাড়ের নানারকম চড়াই উতরাই করিতে করিতে যাইতেছি; এক জায়গায় দেখিলাম গাঁদা গাছ রহিয়াছে, অপর জায়গায় হেনা গাছ, তৃতীয় স্থানে কাঠ-গোলাপ; মল্লিকা এবং চামেলি ফুলগাছও দেখিয়াছি। স্থানটিতে কোন লোকালয় নাই, পাহাড়ের গায়ে আপনি হইয়া রহিয়াছে। ফুলগুলি একপর্দা অর্থাৎ এক-পাপড়ি, থাকে থাকে নয়,—বেশ দেখাই-তেছে! মাঠে ও বাগানে যে সকল ফুলগাছ হয় তাহারা নানাপ্রকার বর্ণ ও অবয়ব ধারণ করে, কিন্তু সমস্ত ফুল-গাছই প্রাকৃতিক অবস্থায় পাহাড়ে পাওয়া যায়; কেবলমাত্র সার বা বৃক্ষাদির উপযুক্ত আহার্যবস্তু প্রয়োগে প্রাকৃতিক ও প্রাথমিক ফুল ও ফল সহস্রপ্রকারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আমি পাহাড়ের গায়ে একটি আমগাছ দেখিয়া-ছিলাম, আমের অবয়ব হইল আমড়ার আঁটি সদৃশ। কাঁচা অবস্থায় পাড়িয়া দেখিলাম যে, টক রসের সহিত একটু কসা রস আছে। কয়েক মাস পর পাকা ফল পাড়িয়া দেখিলাম যে, তাহাতে দু'এক ফোঁটা রস হইয়াছে, হীরাকসের জলের মতন আস্বাদ; দাঁত ও জিহ্বা ভাল করিয়া মাজিতে

হইল। আমি হাসিয়া আমগাছকে বলিলাম—"বাবাজী! তুমি তো এই! আর তোমার বংশধরেরা লেংড়া ফজ্‌লি হ'য়েছে। তাহারা তোমাকে আদিপুরুষ ব'লে স্বীকার করবে না।" যাঁহারা উদ্ভিদবিদ্যার বিষয় চর্চা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল উপকরণ অতি প্রয়োজনীয়; কিরূপে একটি প্রাথমিক বস্তু হইতে সহস্রপ্রকারে বস্তুর পরিবর্তন হইতেছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা একটি বিশেষ শাস্ত্র, আর হিমালয়-অঞ্চলে ইহা শিখিবার বিশেষ সুবিধা।

দেওদার

আমরা এইরূপে চলিতেছি, এমন সময় একটি পাইন গাছের জঙ্গলে পৌঁছিলাম। পাইন (Pine) বা দেবদারু গাছ পাহাড়ের গড়েন ধারেতে হইয়া থাকে, পাহাড়ের সমতল স্থানে হয় না। এই দেবদারু যেখানে হয় সেখানে বায়ু অতি বিশুদ্ধ; স্নিগ্ধ হাওয়া সর্বদা প্রবাহিত হয়, ছায়া সুশীতল। আমার ধারণা, যদি এই স্থানের পাইন জঙ্গলের ভিতর 'থাইসিস' রোগীর থাকিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে রোগীর উপকার হইতে পারে।

বুইরাথ (Beirut) নগরে বড় ম্যালেরিয়া হইত। শহরে আর কেহ বাস করিতে পারিতেছিল না। একজন ফরাসী ডাক্তার বুইরাথ ও ডামাস্কাসের মধ্যে কয়েক মাইল যে বালির মাঠ আছে, তথায় 'পাইন' (ঝাউগাছের) জঙ্গল

করিতে উপদেশ করে। পরে বালির মধ্যে জঙ্গলটা যখন বড় হইল, অর্থাৎ গাছ যখন বড় হইল, গাছের স্নিগ্ধ হাওয়াতে সমস্ত ম্যালেরিয়া বিদুরিত হইল। আমি এই জঙ্গলে খুব বেড়াইয়াছিলাম; এবং স্থানীয় লোকদের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম। ইহা বইতেও আছে যে, পাইন গাছ ম্যালেরিয়া নিবারক।

প্রাণেশ একটা শুকনা দেবদারুর ফল তুলিয়া লইল, এটা শুকনা গাছের চোক্‌লা। কিন্তু দূর হইতে অনেকটা আনারসের মতন দেখিতে। আনারস সরস ও সুস্বাদু, কিন্তু এটা হইল শুকনা কাঠ। ইংরাজী ভাষায় শব্দ না থাকায়, আনারসের এরূপ এক বিকৃত শব্দ হইয়াছে। আনারসকে এইজন্য 'পাইন-অ্যাপ্‌ল' বলে।

এই দেওদার বা দেবদারু গাছ বাংলা দেশের ঝাউগাছের অন্য রূপ। ইহা তিন শ্রেণীর হয়—'দেওদার', 'চির', 'কেলু' (Pine, Fir, Cedar)। ইউরোপের পাহাড়ে যে সকল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতীয় অনেক গাছ হিমালয়ে দেখিয়াছি।

ওক্‌ (oak) গাছকে এদেশে 'বাজ' বলে—কাশ্মীরে 'চানার' বলে। কারণ ওক্‌ গাছ একটা জাতীয় নাম। আমি বহুপ্রকারের ওক্‌ গাছ দেখিয়াছি (Plane oak, dwarf oak ইঃ)। এই গাছের ফল, acorn বা 'বালুত' পিশিয়া আটা করিয়া রুটি খাইয়াছি; দক্ষিণ পারস্যদেশে পর্যটন-

কালে ইহা খাইয়াছিলাম। যাহা হউক, হিমালয় প্রদেশে ইউরোপের পাহাড়ের অনেক গাছ দেখিয়াছি।

ঝাউ গাছের ঝুরি বোরার ভিতর পুরিয়া অনেক জায়গায় গদি ও বালিস করে। ইহা অতিশয় নরম ও একটু একটু সুগন্ধি আছে। দুইমাস পরে ঝুরিগুলি বদলাইতে হয়। আমি ইহার গদিতে শুইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ দেওদার গাছের ঝুরি লইয়া চাষারা ক্ষেতে রাখিয়া দেয় এবং ক্ষেতের এক কোণে এই ঝুরিগুলিতে আগুন লাগায়। হাওয়া বহিতে থাকিলে আগুনটা সব ক্ষেতময় ছড়াইয়া পড়ে এবং ঝুরিগুলি কালো ছাই হইয়া যায়। পাহাড়ীরা বলিল যে, এই ছাই ক্ষেতের পক্ষে ভাল সার।

ধুনা প্রস্তুত

এক জায়গায় একটা দেওদার গাছেতে গর্ত দেখিলাম; কয়েকজন পাহাড়ীকে পথে পাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কি করিয়া ধুনা বাহির করে বুঝাইল। পাহাড়ের গা'টা গড়েন, এজন্য নীচের দিকে এবং ডান ধারে ও বাঁ ধারে পাথরের ছোট তিনটি আল (আইল) করে এবং মাটি দিয়া আলের মাঝের ফুটা বন্ধ করিয়া দেয়, মেঝেটা যথা-সম্ভব একটু জল দিয়া নিকাইয়া দেয়। জঙ্গলের কর্মচারী আসিয়া গাছের গোড়া থেকে তিন-চার ফুট উপরে একটি দাগ দিয়া যায়; সেই দাগের জায়গাতে চার-পাঁচ ইঞ্চি চওড়া

ও সাত-আট ইঞ্চি 'গহেড়া' একটা 'হাড়ল' করে। তারপর সেই গর্তের ভিতর আগুন ধরাইয়া দেয়। আগুন যেমনি তাতিতে থাকে গাছের রস অমনি হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসে, পাথরের আলের গায়ে লাগিয়া রসটা জমিয়া যায়। একটা পরিমাণ পর্যন্ত রসটা লইতে পারে। তারপর গর্তের ভিতর জল দিয়া আগুন নিভাইয়া দেয়। তাহা না হইলে গাছটা মরিয়া যায়। তারপর সেই ধুনার চাবড়াগুলি কলিকাতায় আসে। এইরূপ ধুনার চাবড়ার ভিতর গেঁজ্লা গেঁজ্লা দেখিতে পাওয়া যায়, কাঠি দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি, পাথরও দেখিতে পাওয়া যায়। বেনের দোকানে ধুনার চাবড়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এসমস্ত বেশ বুঝা যায়। পাইন গাছের বিষয় অনেক বলিবার আছে। ইহা কারবারেরও বিষয়। জাহাজের মাস্তুল এই দেওদার গাছে হয়।

চা ও 'বানাপ্সা' ফুল

এইরূপে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে আমরা সন্ধ্যার সময় দেউড়ীতে পৌঁছিলাম এবং আমাদের পূর্ব পরিচিত গুর্খাদলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেই বেশ আনন্দিত হইলাম। কারণ সকলেই আমরা মায়াবতীর দিকে যাইব। দেখাশুনার ভার সুবেদার-পত্নী লইল। আমরা একটু সুস্থ হইলাম; রাত্রে ডাকবাংলার পাশের ঘরটাতে আমরা

শয়ন করিলাম এবং গুর্খারা রুটি আর তরকারি রান্না করিয়া আমাদের খাইতে দিল। যাহা হউক, আমাদের আর আলাদা রান্না করিতে হইল না। সন্ধ্যার সময় দেউড়ীতে সুবেদার-গিন্নী ও তাহার সহিত তাহার পুত্র-কন্যা সকলে একত্রিত হইল। বৃদ্ধা সুবেদারনী বড় চা-প্রিয়। এজন্য আমারও চা পানের সুবিধা হইল। তাহার চা করিবার প্রথা অন্যবিধ—গরম জলেতে দুটি চা দিল ও শুকনো 'বানাপ্‌সা' (violet) ফুল দিল। চা'টা লাল হইলে দুধ চিনি মিশাইয়া নিজে পান করিত ও আমাকেও দিত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, চায়ে দুটি 'বানাপ্‌সা' ফুল দিলে চায়ের উগ্রতা কাটিয়া যায়। এই 'বানাপ্‌সা' ফুলের সরবৎ আমি লাহোর ও অপর কয়েক জায়গায় পান করিয়াছি। হাকিমী মতে ইহা স্নিগ্ধ পদার্থ। কিন্তু চায়ের সহিত এই প্রথম পান করিলাম। বুঝিলাম যে, চায়ে দিবার জন্য এ অঞ্চলে 'বানাপ্‌সা' ফুল পাওয়া যায়। পরদিন প্রাতে গুর্খাসকল, প্রাণেশ ও আমি চম্পাবতীর দিকে চলিলাম।

সুস্বাদু রুটি ও তরকারি

বেলা প্রায় বারোটা হইয়া গেল, সেই সময় পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের ঝোপ ও জলের উৎস মিলিল। সুবেদারনী সেইস্থানে রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিল—ছোট ছোট মোটা-মোটা রুটি চাটুতে সেঁকিয়া উপর উপর করিয়া একস্থানে

রাখিল, তাপটা রুটির ভিতর বেশ বসিয়া যাইল। তারপর রুটির গোছাটা উল্টাইয়া গায়ের গুঁড়ি ঝাড়িয়া চাটুতে রাখিল, ছু-তিন ফোঁটা ঘি রুটির চারিদিকে চাটুর উপর দিল, সেই সামান্য ঘিয়েতে রুটিখানা এপিঠ ওপিঠ করিয়া ভাজিল। এই রুটি খাইতে অনেকটা ডালপুরির মত হইল। দেখিলাম ইহা এক নূতন প্রথা, সামান্য ঘিয়েতে বেশ সুস্বাদু রুটি করা যায়।

তরকারি হইল আলু-চচ্চড়ি,—নুন-ঝাল দিল ও টক ডালিমের বীচি মিশাইয়া দিল (কারণ এদেশে আমচুর বা তেঁতুল নাই)। তারপর পাহাড়ী একরকম পেঁয়াজ-ঘাস আছে, তাহার ফোড়ন দিল, অনেকটা হিং ফোড়নের মত হইল। ঐ রুটি ও তরকারি তুপুর বেলা বেশ পরিতুষ্ট হইয়া খাইয়াছিলাম। নূতন জিনিস বলিয়া বেশ মনে আছে।

চম্পাবতী

আহারের পর আমরা চম্পাবতীর দিকে চলিলাম। খানিকক্ষণ চলিবার পর অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে পৌঁছাইলাম। এস্থানে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা বোধ হইল। প্রাণেশ ও আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। ক্রমেই চম্পাবতী নগরের কাছে আসিলাম। এস্থানে পাদ্রীদের স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে এবং কয়েকটি পাহাড়ী স্ত্রীলোকও খৃষ্টান

হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে চম্পাবর্ত্ত নগরে প্রবেশ করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তথায় পুরানো শিবের মন্দিরে থাকিবার স্থান পাইলাম; ঐ স্থান হইতে বাজারও নিকটে। সুবেদারনী সেইদিন ভাত ও ডাল করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধা ভগিনী বা আত্মীয়া ভিন্নগোত্র হওয়ায় একসঙ্গে ভাত ও ডাল খাইল না। পাহাড়ীদের ভিতর দেখিলাম ভিন্নগোত্র হইলে একসঙ্গে ভাত ডাল খায় না, কিন্তু রুটি খায়। একসঙ্গে ভাত আর ডাল খাবে না।

ঔষধ লইবার জন্য অনেকদূর হইতে পাহাড়ীরা দল বাঁধিয়া আসিত। আশ্রমের ভাঁড়ারী প্রত্যেককে খাইবার মত আটা দিত। তারা সেই আটাতে মোটা-মোটা রুটি করলে; সিদ্ধ করা আলুর বড়ি করে শুকিয়ে নিয়ে আসত। একটা হাঁড়ীতে জল দিয়ে ফুটাত, তাতে নুন-ঝাল একটু দিয়ে আলুর বড়িগুলো ফেলে দিত; ফুটলে, আলু জলের ফেনের মত হ'য়ে যেত। তাই আর রুটি খেত; ফেন বা যবের ছাতু গেলা গেছ হ'ল। রুটি ও আলু খেতে কোন দোষ নাই। ভাত আর ডাল খেতে ভিন্নগোত্রে নিষিদ্ধ।

চম্পাবতী নেপালের অধিকারকালে একটি বড় শহর ছিল। অদ্যাপি পুরাতন পাথরের কেল্লা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শহরটি হইতেছে ঐ স্থানের 'তশীল' (তহশীল) অর্থাৎ একপ্রকার কালেক্টরী। বাজারটিতে মোটামুটি পাহাড়ীদের দরকারী জিনিস বেশ পাওয়া যায়।

শিব-মন্দির

শিবের মন্দিরে তাম্রফলকে দেবসেবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও লেখা আছে। সুবেদারনী গুর্খা ভাষা বেশ জানিত, সেজন্য তাম্রফলক বেশ পাঠ করিল। একটা বিশেষত্ব দেখিলাম, এই মন্দিরে 'ইউক্যালিপ্‌টাস্‌' গাছ আছে। এই গাছ পাহাড়ের অন্যত্র অতো লক্ষ্য করি নাই। শিবের মন্দিরের নাহালা হইতে অনেকদূর পর্যন্ত লোকে জল লইয়া যায়।

নদীর একদিকে দেখিলাম যে, ভৈরবের আস্তানা—একটি মাটির বেদী করিয়াছে, তাহার উপর ছোট ছোট অনেক ত্রিশূল পুতিয়া দিয়াছে; এই সকল ত্রিশূলের গায়ে সিঁদুর মাখাইয়া পূজা, ইত্যাদি হয়। যাহাই হউক, এ স্থানটি গ্রামবাসীদিগের পূজাপাঠের স্থান।

নাথ-এ পাওয়া

গরমীকালে এই দেশে নাথ-এ পায়। আগে বাংলাদেশে কোন কোন লোককে পঞ্চাননে ভর করিত। ইহাকে বাবা-ঠাকুরের ভর করা বলিত। কেহ বা ইহাকে 'মৌয়ো' পাওয়া বলিত। এই সকল হইল পুরানো শব্দ। পাহাড়ে এই 'নাথ' ভর করিলে পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাচিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজায়, দূর গ্রাম হইতে জিনিসপত্র পূজার জন্য লইয়া আসে, আর সেই সময় আচ্ছন্ন ব্যক্তি নানাপ্রকার

ভবিষৎ-বাণী বলে। বাংলাদেশে আগে এই প্রথাটা খুব ছিল। মায়াবতীতে একটি কম্পোজিটারের (compositor) মাঝে মাঝে এইরূপ 'নাথ' ভর হইত। কিন্তু বড় কম্পোজিটার মোহন সিং ছু-চারবার ভালরকম ডাণ্ডা দিয়া তাহার ভূত ছাড়াইয়া দিয়াছিল। তারপর হইতে সে আর হাত খেঁচা-খুঁচি করিতে সাহস করিত না। "মারে ডাণ্ডা, ভাগে ভূত"। যাহা হউক, এ অঞ্চলে গরমীকালে বড় নাথ-এর প্রভাব হয়। বিশেষতঃ যে স্থানে ভৈরবের আস্তানা ও নদী থাকে সেই স্থানেই নাথ-এর প্রভাব বেশী হয়। আমরা সে রাত্রি সেখানে থাকিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া মায়াবতীর দিকে চলিলাম।

মায়াবতী

চম্পাবতী হইতে আহার করিয়া আমরা সকলেই মায়াবতীর দিকে চলিলাম। নীচেকার পাহাড়ী পথ দিয়া যাইতে যাইতে এক ইংরাজের চায়ের বাগান পাইলাম। চায়ের বাগানের রাস্তা দিয়া আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম এবং মাঝে মাঝে 'কাঁকড়'এর (Barking deer) আওয়াজ আসিতে লাগিল। এই স্থানটাতে দেওদার গাছের জঙ্গল। পাহাড় ও দেওদার গাছের জঙ্গল দেখিয়া আমাদের বড় আনন্দ হইল এবং আমি রঘুবংশ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—

"অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন"

[রঘু ২য় সর্গ, ৩৬]

ক্রমশঃ পাহাড়ের উপর উঠিলে একটা কচ্ছপের খোলার মত অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি পাইলাম। এই স্থানটিতে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা মায়াবতীর সীমানায় প্রবেশ করিলাম। প্রথম দেখিলাম, দেওদার, চির ও কেলু (fir বা cedar) গাছের একটি জঙ্গল, তাহার পর ক্রমাগত উপর দিকে উঠিয়া পাহাড়ের শীর্ষস্থানে পৌঁছাইলাম এবং নিম্নদেশে দেখিলাম আশ্রম। পাহাড়ের উপরে চারিদিকে জঙ্গল ও উঁচু-নীচু স্থান। কিন্তু সহসা উচ্চ স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি ও গৃহাদি দেখিলে অতীব আনন্দ হয়। এক-দিকে পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল,—প্রকৃতির অসংস্কৃত ভাব, সমস্ত যেন এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে এবং অপরদিকে নিম্নস্থানে মানুষের শক্তির পরিচায়ক সমতলভূমি—উদ্যান ও গৃহাদি। প্রকৃতির শক্তি ও মানুষের শক্তি, পরস্পরের দ্বন্দ্ব-ভাব এইস্থানে দেখা যায়। দুই শক্তিই প্রণম্য, দুই শক্তিরই মাধুর্য আছে। পাহাড়ের উপর হইতে আমরা সকলে আশ্রমকে প্রণাম করিলাম।

আশ্রম

গায়ের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইলাম চা খাওয়ার সময় হইয়াছিল, এজন্য উপস্থিত হওয়া মাত্রই

চা পাইলাম। সেই সময় দেখিলাম, আশ্রমে একটি অফিস বাড়ী হইয়াছে। দ্বিতীয় হইল বড় বাড়ী অর্থাৎ আশ্রমের বড় বাড়ী, সঙ্গে পাকশালা বা রান্নাঘর; অন্যদিকে অভ্যাগত-গৃহ, তাহার কিছু পরে নূতন ডাক্তারখানা। অপর দিকে মাদার সেভিয়ারের (Mother Saviour) বাড়ী এবং অপর দিকে একটি অভ্যাগত-গৃহ। প্রাণেশ ও আমি উপরকার অভ্যাগত-গৃহে রহিলাম। গুর্খারা নীচেকার অভ্যাগত-গৃহে যাইল। চা পান করিয়া মাদার সেভিয়ারকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। সে সময় গুরুদাস আশ্রমে ছিল। বিরজানন্দ তখন শ্যামলাতলে; কয়েকদিন পরে মায়াবতীতে আসিল।

মায়াবতীর পাহাড়ে বড় জোঁকের উৎপাত। মেটে পাহাড় ও চারিদিকে গাছপালা। সেইজন্য এই জঙ্গলটাতে অতিরিক্ত জোঁক; বাংলাদেশের সব জোঁক একত্রিত করিলে বোধ হয় মায়াবতী-অঞ্চলের জোঁকের সমান হইতে পারে। বড় ঝরনার কাছে দেখি, ঘাস ও লতাপাতাগুলো নড়ছে। "লতাপাতা নড়ে কেন?" বলায় বললে—"মশায়! ছোট ছোট জোঁক মানুষের গন্ধ পেয়েছে।" মায়াবতীতে একটা নুনের পুঁটলি হাতে ক'রে যেতে হ'ত। জোঁক ধরলে নুনের পুঁটলি চেপে ধরলে জোঁক পড়ে যায়। জোঁকের বিষয় অনেক গল্প শুনেছি। একটা গল্প হ'চ্ছে—গরু চরতে গেলে ছোট জোঁক তার নাকের ভিতর ঢুকে যায়। ক্রমে ভিতরে গিয়ে বড় হয়। গরুটা হাঁ ক'রে থাকে, খেতে পারে না; নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে

আসে। পাহাড়ীরা বললে—"গরুটাকে একদিন দু'দিন জল খেতে দিই না, গরুটার বড় যন্ত্রণা হয়। তখন গরুটাকে জলের কাছে নিয়ে যাই আর মুখটা তুলে নিই। জোঁকটা জল দেখে নাকের ভিতর দিয়ে মুখ বার করে, তখন ফেলে দিই।"

ঝরনার জল পান

মায়াবতীর ঝরনার জল অতি বিখ্যাত। আমি নিজে ইহা খাইয়া অনেক উপকার পাইয়াছিলাম; তবে নিয়ম হইতেছে—ঝরনার ধারে বসিয়া গেলাস লইয়া একঢোক করিয়া জল খাওয়া এবং বাকী জলটা ফেলিয়া দেওয়া; পুনরায় টাটকা জল লইয়া একঢোক খাওয়া, বাকী জলটা ফেলিয়া দেওয়া। এইরূপে ঢোকে ঢোকে অনেকক্ষণে দু-তিন গেলাস জল খাইলে অনবরত প্রস্রাব হইবে। শরীরের ভিতরটা ধুইয়া সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দিবে। প্রত্যেকবারে টাটকা জল একঢোক করিয়া খাইলে জলের গুণটা পাওয়া যায়।

বড় ঝরনায় স্নান

আমি ও প্রাণেশ যখন মায়াবতীতে গিয়াছিলাম তখন আমার শরীর অতিশয় দুর্বল; দেওয়াল ধরিয়া চলিতাম। মায়াবতীর নিয়ম হচ্ছে—ছোট ছোট কামরা আছে, গরম জল দেয়, সেখানে নাইতে হয়। আমি একদিন একটা ছেলেকে

গা-খোলা দেখে বললুম—"তুই গ্যাড়গেড়ে ছেলেটা ছিলি, তোর এমন লোহার শরীর হ'ল কি করে?" সে বললে—"আমি ঝরনায় নাই।" প্রথমদিন শৈল, প্রাণেশ আর আমি সেই ছেলেটির সঙ্গে যাব, সকলে নিষেধ করলে; বললে—"বুকে ঠাণ্ডা লাগবে।" সেদিন গরমজলে নাইলাম। তার পরের দিন জামা পরেছি, ধোসা গায়ে দিয়েছি, ভেতরে কাপড় গামছা, সাবান, লোটা ও গেলাস নিয়েছি, একে একে যেন পায়চারী করতে বেরলুম; বড় ঝরনার কাছে উপস্থিত হলুম। তারপর গায়ের জামা কাপড় খুলে গাছের ডালে রাখলুম। তখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস, কিন্তু মায়াবতীতে ভয়ানক শীত। জামা-কাপড় গাছে রেখে গা ঘসতে ঘসতে, লাফাতে ও চেঁচাতে লাগলুম। তারপর গা একটু গরম হ'লে গেলাস নিয়ে ঝরনার জল খেতে সুরু করলুম। ঝরনার জল গেলাসে নিয়ে এক ঢোক খাই আর ফেলে দিই, জলের তেজ ভেতরে যেতে লাগল। জল কনকনে বরফ। আট-দশবার এমন করার পর প্রস্রাব সুরু হ'ল। এমন ভয়ানক দুর্গন্ধ প্রস্রাব যে, নাক টিপে রইলুম; বাঘের প্রস্রাবের মত, পায়ে লাগল যেন ফুটন্ত জল। ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধ কেটে গিয়ে সাদা জলের মত প্রস্রাব বেরুল। পেটটা যে ফুলো ছিল, বসে গেল; পেট ধুয়ে গেল, শরীরে যেন জোর আসতে লাগল। তারপর ঘটি ক'রে জল নিয়ে মরি-বাঁচি ক'রে মাথায় দিলুম। এত ঠাণ্ডা, যেন গা'টা জ্বলে গেল। তাড়াতাড়ি ক'রে সাবানটা গায়ে বুলিয়ে

আর এক ঘটি জল ঢেলে শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছে ফেললুম; কাপড় ভেজানো আর হ'ল না। জামা আর ধোসা-খানা গায়ে দিয়ে আধভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেললুম, পরে সেখানা হাতে ক'রে নিলুম। যেন হঠাৎ নূতন শরীর পেলুম। ঘর থেকে ঝরনায় যাবার সময় বেঁকে অতি কষ্টে গেছলুম, আসবার সময় সিধে হ'য়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় পা ফেলে আসতে লাগলুম। ব'লতে লাগলুম—"আজ আমার শরীর ভাল হ'য়েছে, আজ খুব খাব।" ঐরকম করাতে খিদে বেড়ে গেল, আর শরীরে তেজ এল।

একদিন আমরা রাত্রে খেতে বসেছি, আমি বললুম, "আজ আমার বড় খিদে।" সকলে বললে, "খান না।" আমি বললুম—কত রুটি আছে? চিবোতে লাগলুম, চোয়াল ব্যথা করতে লাগল। পা ছড়িয়ে চোখ বুজে জিরুতে লাগলুম। বললুম, "চাকরদের রুটিও দাও। চাকররা ক'রে নিগ।" এমনি ক'রে চাকরদের রুটিও সব খেয়ে দিলুম। কিন্তু জলের এমন গুণ, কোন অসুখ হয় নাই। সকালে যেমন পেট পরিষ্কার হয় তেমন হয়েছিল। মায়াবতীর বড় ঝরনাটা বিখ্যাত—স্বাস্থ্যকর জল। তাই উল্লেখ করলাম।

পাহাড়ে বেড়ান

প্রাণেশ একদিন খুব সকালে উঠে পাহাড়ে বেড়াতে গেল। অনেকটা চলে গেছে; রাখাল, যে গরু চরাত,

এসে বললে, "ওঁকে ঐদিকে যেতে বারণ করবেন। বাঘেরা সমস্তক্ষণ চরে বেড়িয়ে ভোরবেলায় ঐখানে জল খায়।" সকলে বারণ করাতে প্রাণেশ আর সকালে যাইত না। আমরা মাঝে মাঝে বিকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম। কখনও কখনও পাহাড়ের গায়ে 'পাকদণ্ডী' দিয়া যাইতাম। চা খাইবার পর ঐ পাহাড়ে বেড়াইতে যাওয়ায় যেন একটা আনন্দ লাগিত।

হরিণ

এই পাহাড় অনেক উঁচু হওয়ায় গরমীকালেও বিশেষ ঠাণ্ডা থাকে এবং শীতকালে বরফ পড়ে। স্থান অতি সুরম্য, বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। কিন্তু এই জঙ্গলে বড় বাঘের উৎপাত; কারণ এই জঙ্গল একেবারে নেপালে চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঘ আশ্রমের ভিতরও ঢুকিয়া পড়ে। ছোট হরিণ এই জঙ্গলে যথেষ্ট আছে। বড় হরিণ, বড়া শিঙ্গা, 'গবল' (পাহাড়ী কথায় বল্গা হরিণ, গওয়াল এবং ইংরাজী কথা, reindeer) তাহাও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নানা জাতীয় ছোট হরিণ যথেষ্ট আছে। আর একটি লক্ষ্যের বিষয়, একদিন আমি বড় আশ্রমের সুমুখে বেঞ্চিতে বসিয়া আছি, এমন সময় খুব নিকটের জঙ্গলে যেন মুরগী ডাকিল, আওয়াজ ঠিক মুরগীরই মতন। কিন্তু এত দ্রুতবেগে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া গেল যে, চেহারা দেখিতে পাইলাম না।

ঘাস ও গাছ

এইখানকার ঘাস অন্যপ্রকার। বাংলাদেশে দূর্বা বা মুথা ঘাস হইয়া থাকে, কিন্তু মায়াবতী ঠাণ্ডা দেশ হওয়ায় ঘাস ঈষৎ কোঁকড়ান ও অন্যজাতীয়। ইংলণ্ডের মাঠে ঘাস অনেকটা এই শ্রেণীর হয়। এইজন্য মায়াবতীর ঘাসের উল্লেখ করিলাম। এইস্থানে দেখিলাম 'বাজ' (oak) গাছ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। বরাট ফুলের গাছ (Rhododendron) অনেক দেখিলাম। এতদ্ব্যতীত চারাগাছ ও শাকজাতীয় গাছ অনেক, অর্থাৎ এই স্থানটি উদ্ভিদ-বিদ্যা শিখিবার একটি বিশেষ জায়গা। যদি এই অঞ্চলে একটা উদ্ভিদ-বিদ্যালয় হয় তাহা হইলে অনেক গাছের আবিষ্কার হইবে।

মায়াবতীতে চাষের ক্ষেত আলাদা আর আনাজ-তরকারির ক্ষেত আলাদা। সাটন-এর আমেরিকান বীজ দিয়া নানা রকম আনাজ-তরকারি হ'ত। আমি পেঁয়াজ দেখিয়াছি একটা বড় শাঁখের মত। একজন আমাকে বললে—আপনি যখন ছিলেন মায়াবতীতে তখন ঐ রকম পাহাড়ের উপর আধসের একটা পেঁয়াজ হয়েছিল। এখানে সাটন-এর বীজ দিয়া অনেক রকম বড় বড় আনাজ-তরকারি করিতেছে দেখিলাম।

প্রজাপতির মেঘ

এইখানে একটি বিশেষত্ব দেখিলাম—বরফের শৈত্য কাটিয়া গিয়াছে, প্রজাপতির ডিম ফুটিল, একসঙ্গে একটি ঝাঁক

উড়িতে লাগিল, ঠিক যেন একখানা ছোট মেঘ। প্রজাপতির পরমায়ু দেখিলাম আড়াই দিন, অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হইল। আশ্রমের চারদিকে প্রজাপতির দেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। আবার আর কতকদিন পরে আর এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়িল। এইরূপে প্রজাপতিগুলি আড়াই দিন থাকিয়া মরিয়া গেল।

আশ্রমের ভগবতী-রূপ

মায়াবতীতে কয়েকদিন থাকিবার পর শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল (শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে, ইনি বর্তমানে জয়পুর শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ)। আমার ও প্রাণেশের বড় আনন্দ হইল। শৈল চিত্রকর, এজন্য অনেক স্থানের রেখা (sketch) অঙ্কিত করিয়া লইতে লাগিল।

একদিন শৈলেন ও আমি পাহাড়ের একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া আছি, সেখান হইতে আশ্রমের সকল দৃশ্যটা দেখা যায়। উপরকার পাহাড়টা, যেন ভগবতী স্থির হইয়া বসিয়া আছেন—গায়ে সবুজ-বর্ণ বসন; আশ্রমের উভয় পার্শ্বে দুইটি টিলা বা ছোট পাহাড়, যেন স্তন হইয়াছে, ঝরনা বা উৎস কয়েকটা, যেন স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইতেছে; এবং আশ্রমের অপরদিকের পাহাড়, ঠিক দেখিতে হইল যেন, একটা সিংহ মাথা উঁচু করিয়া পা মুড়িয়া মেঝেতে বসিয়া আছে; যেন ভগবতীর চরণতলে সিংহ আনন্দে স্থির

হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। শৈল এই দৃশ্য-রেখাটি অঙ্কিত করিয়া লইল।

জঙ্গলে শোকার্ত্তভাব

আর একদিন শৈল ও আমি চম্পাবতীর দিকে খানিকটা যাইলাম, যেখানটায় দেওদার গাছের জঙ্গল আছে। সেখানটা এত নিবিড় যে, রৌদ্রপর্য্যন্ত নামে না। গাছের ডাল হইতে অনেক ঝুরি নামিয়াছে, স্থানটা শোকের ভাবেতে পরিপূর্ণ। শৈলকে বলিলাম যে, দেখ, এই স্থানটা দেখিতে কি রকম জান? যেন একটা বুড়ি পা ছড়াইয়া বসিয়া মাথার চুল এলাইয়া শোক করিতেছে। জায়গাটা দেখিলে যথার্থই মনে একটা শোকের ভাব আসে। ঠিক যেন কুমারসম্ভবের রতিবিলাপের মত দেখিতে হইল :—

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা সমদুঃখামিব কুর্বতী স্থলীম্॥

[কুমারসম্ভব, ৪র্থ সর্গ]

প্রকৃতি-উদ্যান

এইরূপে শৈল ও আমি পাহাড়ের অনেক জায়গায় বেড়াইতাম ও শৈল রেখা অঙ্কন করিত। একদিন শৈলতে আমাতে আশ্রম হইতে উপরকার পাহাড়ে উঠিলাম; চলন্তি পথ দেখিতে না পাইয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। একটা গাছের সারি,—ঠিক যেন,

মাঝারিগোছ অশ্বত্থ গাছ; পাতা কিরকিরে, ফুল একপর্দা, সাদা, কিন্তু গাছটা কি, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। আশ্রমে আসিয়া জিজ্ঞাসা করায় সকলে বলিল যে, ওটা গোলাপ গাছ। এত বড় গোলাপ গাছ কখন দেখি নাই বলিয়া এত বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। পরে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের ভিতর মাঝে মাঝে এরূপ বড় গোলাপ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড় হইল প্রকৃতির উদ্যান। এজন্য এরূপ গোলাপ গাছ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

সুবেদারনীর বিচক্ষণতা

আমরা সুবেদারনীর সহিত একসঙ্গে আসিয়াছিলাম। পরে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে খাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। সরস্বতী সুবেদারনী, বুদ্ধিমতী ও বিবেচক। একদিন বলিল যে, অনেকখানি খালি জমি আশ্রমে রহিয়াছে; আখরোট গাছ লাগাইলে কয়েক বছর পরে অনেক ফল হইতে পারে। আখরোট গাছ হইতে কিছু আয় হইতে পারে এবং কাঠ হইতেও কিছু আয় হইতে পারে। এইরূপ আখরোট গাছ লাগাইলে আশ্রমের কিছু আয় হয়। আর একদিন বলিল যে, পাহাড়ী ভাষায় ঠাকুরের কথা ও প্রসঙ্গ ছোট ছোট বই করিয়া এক পয়সা দুই পয়সা দাম করিয়া যেখানে যেখানে মেলা হয় সেই জায়গায় বিতরণ করিলে

ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব ছড়াইতে পারে। পাহাড়ের অনেক জায়গায় মেলা বা লোকসমাগম হইয়া থাকে, এইরূপে দু'এক পয়সার বই বিক্রী হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। এইসকল কথায় বুঝিলাম যে, সুবেদারনীর বেশ বুদ্ধি ও বিচক্ষণ ভাব আছে।

মাছধরা

একদিন খেয়াল হইল যে, আশ্রমের নীচের দিকে যে একটা নালা আছে (তাহাতে প্রায় দু' ইঞ্চি গভীর জল প্রবাহিত হয়) সেই নালায় গিয়া মাছ ধরিতে হইবে। খাওয়াদাওয়ার পর সকলে তৈরী হইল। সীতাপতি * আমাকে ও আর কয়েকজনকে সাথে লইল। মোহন সিং (বড় কম্পোজিটার) সে তো অধিনায়ক হইল। পাহাড়ের গা দিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। কতকগুলি গরু দেখিলাম লেজ তুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কি ? একটা লোক বলিল যে, গরুগুলিকে একটা বাঘে তাড়া দিয়াছে। আমাদের তো শুনিঁয়া গা ছমছম করিতে লাগিল। তাহার পর প্রায় হাজার ফুট নীচে নামিলাম। দুই ধারে পাহাড়, মাঝখান দিয়া একটি সরু নালায় জল যাইতেছে; ঘন ঝোপ ও জঙ্গল—সে যেন, রাবণের নিকুম্ভিলার যজ্ঞপুরী! মোহন সিং একটি আলপিনকে

* স্বামী রাঘবানন্দ।

বাঁকাইয়া তাহাতে সুতা বাঁধিয়া পাথরের মাঝে জলেতে যে মাছ খেলিতেছে তাই ধরিতে গেল, সুবিধা হইল না। তারপর লাঠি ছোট ছোট মাছের মাথায় টিপ করিয়া মারিতে লাগিল। মাছটা উল্টাইয়া গেল আর ধরিতে লাগিল। এইরূপে ছোট ছোট মাছ এক পোয়া হইল। মাছটা দেখিতে অনেকটা ছোট ছোট ভূতি বেলের মত বলা যায়। উপরে এসে লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিলাম; আমাদের খুব দিগ্বিজয় হইয়াছে, ভারি আহ্লাদ যে, পাহাড়ী নদীতে মাছ ধরেছি। রাত্রিতে চচ্চড়া করে সেই মাছ একটু মুখে দিলুম। আমোদ হইল—পাহাড়ীরা লাঠি দিয়া কি করিয়া মাছ মারে এইটি দেখিতে পাইলাম।

লোহাঘাট

একদিন খাওয়াদাওয়ার পর লোহাঘাট গ্রাম দেখিতে যাইলাম। সীতাপতি আমাকে মধ্যাহ্নে আহারের পর সঙ্গে লইয়া লোহাঘাটে চলিল। পথটি যদিও তিন মাইল কিন্তু নিবিড় জঙ্গল এবং চড়াই উতরাই করিয়া যাইতে হয়; পথে অজস্র জোঁক। হিংস্র জন্তু ও বাঘের ভয় আছে।

ছোট একটি গ্রাম পার হইয়া আমরা লোহাঘাটে গেলাম। তখন এইখানে পোস্ট-অফিস ছিল, অনেক চা-বাগানও ছিল। সীতাপতি আমাকে লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে সব গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল এবং দূরে তুইঘর

ফিরিঙ্গী বাস করে তাহাও দেখাইল। দুইজন সামরিক ইংরাজ বৃত্তি (Pension) পাইয়া পাহাড়ী স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া এইস্থানে বাস করিতেছিল। সাধারণ লোকের কাছে তাহারা ইংরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও মাদার সেভিয়ার তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন না। মাদার সেভিয়ার পাহাড়ীদের সহিত যদিও খুব স্নেহপূর্ণভাবে কথাবার্তা কহিতেন ও মিশিতেন, কিন্তু এই দুইঘর লোকের সহিত কখনও আলাপ করিতেন না। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করায় মাদার সেভিয়ার বললেন, “পাহাড়ীরা যে ভারতবাসী, ওদের সঙ্গে আলাদা ; কিন্তু ঐ দুইঘর মিশ্রবর্ণ (half-caste), ওদের সঙ্গে আমরা, ইংরাজরা মিশতে পারিনি।” ঐস্থানে খৃষ্টানদিগের কবরস্থান আছে তাহাও দেখিলাম। এই স্থানটি হইল পাহাড়ের মধ্যে সাহেব পল্লী।

সীতাপতির যত্ন

ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ বেড়াইবার পর বড় ক্লান্ত হইলাম। সীতাপতির কি যত্ন। সে পকেটে কয়েকখানা বিস্কুট ও শুকনো চা লইয়া গিয়াছিল। পোস্টমাস্টারকে বলায় সে গরম জল করিয়া সীতাপতির আনীত চা দিয়া আমাদের দুইজনকে চা করিয়া দিল তখন সীতাপতির আনীত চা ও বিস্কুট খাইয়া বিশেষ সুস্থ হইলাম। সীতাপতি এইরূপ আন্তরিক যত্ন করিয়াছিল সেইজন্য এই কথা এখানে উল্লেখ

করিলাম। এখানে মিস বুচারের হাঁসপাতাল না কি একটা ছিল, এইরকম দেখিলাম। মায়াবতীর পথে চম্পাবতীর কাছে ও লোহাঘাটের কাছে ইংরাজ পাদ্রীদিগের মহিলা-আশ্রম খৃষ্টানদিগের একটা মিশনারি-কেন্দ্র। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টান করিয়া লেখাপড়া শেখায়। যাহা হউক, ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল; আবার বাঘ ও জোঁকের ভয় আছে, সেইজন্য চা খাইবার পর সীতাপতি আমাকে লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিল।

বাঘের উৎপাত

একদিন রাত্রে ঘুম হয় নাই; শুনিতে লাগিলাম যেন, একটা বড় জানোয়ার কাছে নিকটে বেড়াইতেছে। পায়ের আওয়াজ বেশ শুনা যাইতেছিল। খানিকটা পরে একটা আর্তনাদের বিকট আওয়াজ হইল। তারপর সব নিস্তব্ধ। সকালে সকলকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, হয়ত একটা মাঝারি-গোছ হরিণকে বাঘে ধরিয়া লইয়া গেল, এইরূপ বাঘের উৎপাত সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একদিন রাত্রে আমি বড় বাড়ীতে খালি রান্নাঘরের ভিতর বাইরের উঠান হইয়া 'ওদিককার ছোট বাড়ীতে যাইব; প্রাণেশ, শৈল ও আমি সেইখানে থাকিতাম। আমি প্রস্রাব করিতে যাইব, উঠানের গায়ে না বসিয়া একধারে বসিতে গিয়াছি. এমন সময় আশ্রমের একটি পাহাড়ী ভৃত্য বাঁ-হাতে

হারিকেন ও ডানহাতে লাঠি তুলিয়া আমার পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমারও প্রথম দেখিয়া ভয় হইল, তারপর প্রস্রাব করিয়া উঠিলে সে আমাকে বলিল, "রাত্রিতে এখানে কখনও আসিবেন না। এই খড়ে অনেক সময় বাঘ ওৎ করে বসে থাকে।" একটা ঝাপটা মেরে ফেলে দিলে প্রায় হাজার ফুট গড়িয়ে চলে যাব। জানিলাম, এ জায়গাটা সন্ধ্যার পর ভয়ের কারণ হয়। আমি তখন আমাদের শোবার ছোট বাড়ীটাতে গেলাম ও সেইখানে তিনজনে শুইয়া রহিলাম।

প্রস্তর-ফলক

চম্পাবতীতে প্রাচীন আর একটি জিনিস দেখিয়াছিলাম তাহা এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি। দুইটি পাথরের স্তম্ভ করিয়া তাহার উপর আর একটি প্রস্তর; ইহাকে ঠিক খিলান বলা যায় না, ইহা কারুকার্যসম্পন্ন প্রস্তর-ফলক। এইরূপ প্রস্তরদ্বারকে ঠিক তোরণ বলা যায় না, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ অট্টালিকায় এইরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; ঘণ্টা ঝুলাইবার উদ্দেশ্য, কি অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল, এখন ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, ইহা একটি প্রাচীন স্থাপত্য-চিহ্ন।

তীর্থপথ

মায়াবতী হইতে মানস সরোবরে যাইবার পথ আছে। যাঁহারা মায়াবতী হইতে মানস সরোবরে যান, তাঁহারা প্রথমে

পৃথরা গড় (পিথোরা গড়) পরে আসকোট তারপর মানস সরোবরের দিকে অগ্রসর হন।

পবিত্র স্থান

আমি অনেক সময় আশ্রমের সুমুখে যে একটু ফাঁকা উঠান আছে তাহার কিনারায় একটা বড় গাছের তলায় বেঞ্চিটাতে বসিয়া থাকিতাম। জায়গা ও দৃশ্য অতি সুরম্য। এই জায়গায় বসিয়া আমি স্থির মনে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম। পরে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছি। এইজন্য এই স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া প্রণাম করি।

ত্রিকূট

একদিন বিকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল; তিব্বতের দিকে পৃথরা গড় ও আসকোটের দিকে বরফের পাহাড়, 'ত্রিকূট' (Cathedral Peak) দেখা গেল। এই পাহাড়ের একটা স্রোত হইতে সরযূনদীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং অপর স্রোত মানস সরোবরের দিকে গিয়াছে। এই বরফের পাহাড় ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মাঝখানে, ইহা দেখিতে অতি সুরম্য। মায়াবতী আশ্রমের ঠিক অপর দিকে একটা উঁচু পাহাড়ের উপর নেপালী রাজত্বকালের পুরাতন এক কেল্লা আছে। আশ্রমের কয়েকটি যুবক একদিন এই কেল্লা দেখিতে যাইল। আমি যাইতে অসমর্থ হওয়ায় দূরবীক্ষণ (Binocular) যন্ত্র দিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; সীতাপতি এই যন্ত্রটি

আমায় আনিয়া দিয়াছিল। এই কেল্লার অনতিদূরে নিম্নদেশে কচ্ছপের পিঠের ন্যায় সমতলভূমি বা থাল আছে। এই স্থানটি অতি সুরম্য, অনেক সময় বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইত। এই অঞ্চলের কয়েকটি পুরাতন ভাঙ্গাচোরা কেল্লা দেখিয়া বেশ বুঝা যাইল যে, গুর্খাদিগের এক-কালে দোর্দণ্ড প্রতাপ ও রাজত্ব ছিল।

চা-ক্ষেত

মায়াবতী পূর্বে চায়ের বাগান ছিল, তারপর আশ্রম হইয়াছে। কিন্তু তখনও (যখন আমি গিয়াছিলাম) চায়ের ক্ষেত ছিল। চা'র ডগার পাতা ছিঁড়িয়া একটা ঘরে আগুনের উপর লোহার জালতি দিয়া খুব ডলাই-মলাই করে। বাহিরে ভয়ানক ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতর প্রচণ্ড গরম। যাহারা ঘরের ভিতর থাকে, চায়ের ডলায়ের সন্নিকটস্থ স্থানে থাকে, তাহাদের কিন্তু নাকে তীব্র গন্ধ লাগে না। আমি একদিন চায়ের ঘর দেখিতে যাইলাম এবং দরজা ফাঁক করিয়া বাহির হইতে দেখিতে লাগিলাম। ঘর হইতে এত তীব্র গন্ধ আসিতে লাগিল যে, আমার মাথা ধরিয়া গেল। চা তৈয়ারীকালে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহা অতি তীব্র। আশ্রমের সকলে বলিল যে, ঐ স্থানে যাইতে নাই; ঐ গন্ধে শরীরের গ্লানি হয়। আর একদিন চায়ের ঘর হইতে গরম চা-পাতা আনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছিলাম এবং তাহাতেও

শরীরে একপ্রকার গ্লানি বোধ করিতে লাগিলাম। সকলে উহা খাইতে নিষেধ করিল।

আমি কয়েকদিন আশ্রমে থাকিবার পর শ্যামলাতল হইতে বিরজানন্দ মায়াবতীতে আসিল। আশ্রমে ছিল তখন সীতাপতি, দেবব্রত (প্রজ্ঞানন্দ স্বামী) ও গুরুদাস। দেবব্রত বসু অরবিন্দের সহিত আলিপুর বোমা-মোকর্দমায় জড়িত ছিল। গুরুদাস হইতেছে ডাচ্-আমেরিকান সাধু। তাহার আসল নাম চার্লস (Charles Havdjlon)। এখনও সে জীবিত আছে।

মাদার সেভিয়ার

মাদার সেভিয়ার যাইবার জন্য তৈরী হইলেন। একটা ছোট কাক ছিল (magpie, crow নয়); একে বলে ছোট জাতের কাক। মাদার সেভিয়ারের সকালবেলা খাবার সময় কাকটি গাছের ডালে বসত আর তিনি একটু একটু রুটি দিতেন। মাদার সেভিয়ার চলে গেলে ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল, সেই কাকটা করুণস্বরে ডাকতে লাগল। সেই কাকটার, পরে কি হ'ল জানতে পারিনি। মাদার সেভিয়ার চলে যাওয়ায় যেন লক্ষ্মী চ'লে গেল। মাদার সেভিয়ার যখন শ্যামলাতলের দিকে চলিলেন—ঝাড়ুদার, মহবুব ঈশাই সেই তালে শ্যামলা-তলের দিকে গেল। (এসব অঞ্চলে অনেক মেয়ে খৃষ্টান হইয়াছে। বৃন্দাবন মথুরায় ইহাদের অনেককে দেখিয়াছি,

আগে তাহারা মুসলমান ছিল, শেষে 'ঈশাই' * যোগ করেছে।) যাহোক, মহবুব চলে গেলে তার বউ ঝাড়ু দিত আর ঘোমটা দিয়ে চোখের জল মুছত। সকলে বললে, "তুমি যেমন ছিলে তেমন থাক।" বউ বলতে লাগল, "মেরা নসিব টুট্ গিয়া"—অর্থাৎ কপাল ভেঙ্গেছে, তাই মাদার সেভিয়ার চলে গেল। মাদার সেভিয়ার যে ওদেশে স্বয়ং ভগবতী ছিলেন, এইটি পাহাড়ীদের মধ্যে খুব ধারণা হইয়াছিল। এই বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। মাদার সেভিয়ার মায়াবতী ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্যামলাতল যাইবেন এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সকলেই শোকার্ত, আমার মনও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পথে আসিবার ও ফিরিবার সময় দেখিলাম যে, পাহাড়ের ধারে বসিয়া পাহাড়ীরা একসঙ্গে তামাক খাইতেছে ও শোক করিতেছে। সকলের মুখে একই কথা যে, কপাল মন্দ, তাই মাদার সেভিয়ার তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল। রাস্তায় বাজারে সর্বত্রই একই কথা যে, মাদার চলিয়া যাইলে কে তাহাদের রক্ষা করিবে, কে তাহাদের আবশ্যক-মত অর্থ দিবে। দেখিলাম, পাহাড়-অঞ্চলে মাদার সেভিয়ারের কি অদ্ভুত প্রভাব! বিদেশী স্ত্রীলোক, মেম; কিন্তু পাহাড়ীরা তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। কারণ মাদার সেভিয়ার অকাতরে অর্থ দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অভিযোগ শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়া দিতেন। কি

* 'ঈশাই' শব্দের অর্থ খৃষ্টান।

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর, কি সরকারী কর্মচারীর উপর, কি পাহাড়ীদের উপর মাদারের কি প্রভাব ছিল!

মাদারের উদার ভাব

একদিন অল্পবয়স্ক এক ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট মাদার সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বোধ হইল, যুবা ম্যাজিষ্ট্রেট অল্পদিন হইল দেশ হইতে আসিয়াছেন, দেশের জন্য মন বড় চঞ্চল। মাদার সেভিয়ার সেই যুবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাড়ীর ছেলের মত নাম ধরিয়া কথা কহিতে লাগিলেন এবং চা ও কেক ইত্যাদি খাইবার জন্য আদর করিতে লাগিলেন। যুবা ম্যাজিষ্ট্রেট যেন দূরদেশে বৃদ্ধা মাকে পাইয়াছেন এইরূপ বোধ হইল। এখানে একটা তশীলদার বা সরকারী কর্মচারীরা যদি পাহাড়ীদের উপর অত্যাচার করিত তাহা হইলে তাহারা মাদারকে বলিয়া দিত। মাদার, ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা করিতে আসিলে, তাহাকে অত্যাচারের কথা বলিয়া দিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তশীলদারদের ধমকাইয়া দিত। তাহাতে সাধারণ পাহাড়ীদের অনেক সুবিধা হইত। মাদার ইংলণ্ডের বড় জমিদার বংশের মেয়ে, কাপ্তেন সেভিয়ারের বিধবা পত্নী। এরা পুরানো ইংরাজ জমিদার ঘর। মাদার সেভিয়ারের কি অমায়িক ভালবাসা, কি উদার ভাব! কি সকলকে স্নেহ আদর করা এবং মুক্ত-হস্তে গরীবকে অর্থ দেওয়া! তাঁর এই সকল কার্য অবর্ণনীয়। যথার্থই তিনি এই অঞ্চলে সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন। নির্ধারিত

দিনে বিরজানন্দ ও মাদার সেভিয়ার রওনা হইলেন। মুটেরা তাঁহার জিনিসপত্র লইয়া ধীরে ধীরে চলিল। ঐ অঞ্চলের সকল লোকে শোকার্ত হইল—আশ্রমের মেথরানী ও ভৃত্য-সকল রোদন করিতে লাগিল। আমারও মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। আমিও ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিন্তু তখনই চলিয়া আসা উচিত নয় বলিয়া তাহার কয়েকদিন পরে প্রাণেশ, শৈল ও আমি চলিয়া আসিলাম।

মায়াবতী হইতে বিদায়

মাদার সেভিয়ার তাঁহার জিনিসপত্রসহ বিরজানন্দের সহিত শ্যামলাতলে চলিয়া যাওয়ায় আশ্রমে আর আমাদের থাকিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে আহারাদি করিয়া প্রাণেশ, শৈল ও আমি মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া আশ্রমের সকলের কাছে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলাম। প্রথমে পাহাড়ে যাইয়া আশ্রম ও আশ্রমের সকলকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া প্রণাম করিলাম, কারণ এই হইল শেষ দেখা। আর আশ্রমে থাকা বা দেখা হইবে না। এজন্য ভক্তিসহকারে যোড়করে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম।

কৈলাস-চিত্র

এইবার আমরা চম্পাবতী যাইবার উপরকার পথ লইয়া-ছিলাম। এজন্য দৃশ্য অন্যপ্রকার হইতে লাগিল। আমরা কয়েক মাইল আসিলে একটি স্থানে পৌঁছাইলাম; রাস্তার

দিকে যে পাহাড়, তাহার গায়ে শৈবাল (moss) আবৃত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তার ধারে নুড়ি-নোড়ার উপর দিয়া সামান্য একটু জলের স্রোত বহিতেছে। বেশ ঝুরঝুর করিয়া আওয়াজ হইতেছে। এই নদীর অপর পার্শ্বে এক উচ্চ পাহাড়। জঙ্গলমহলের এক ডাকবাংলা ছিল এবং চারিদিকে দেওদার গাছের জঙ্গল। স্থানটি অতি নির্জন ও সুরম্য। গল্পতে যেমন কৈলাসের চিত্র অঙ্কন করে, স্থানটি ঠিক সেইরূপ দেখিতে। আমরা পাহাড়ের গায়ে শৈবালের উপর হাত বুলাইলাম। আর একবার উঁচু পাহাড়ের দিকে চাহিয়া বুড়ো-বুড়ীকে (হর-পার্বতী) চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। তিনজনে খুব আনন্দে বিভোর হইয়া আছি, এজন্য উদ্দেশ্য করিয়া বুড়ো-বুড়ীকে ডাকিয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে নন্দীকেও গাল দিতে লাগিলাম; খুব চেঁচাইলাম, খুব হাততালি দিলাম। এইরূপে নানারূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বুড়ো-বুড়ীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রণাম জ্ঞাপন করিলাম। যথার্থই এই স্থানটিতে বাস করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কাছে কোন লোকালয় না থাকায় আহার্য সংগ্রহে বড়ই কষ্ট। এইরূপ অনেকক্ষণ স্থানটি দেখিয়া এবং হর-পার্বতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আমরা ধীরে ধীরে চম্পাবতীর দিকে চলিলাম।

পাহাড়ীদের সাহস

এই দেশের পাহাড়ীদের পাহাড়ে দাঁড়াইবার কি সাহস!

বিকাল হইয়াছে, পাহাড়ী গৃহস্থের গরু নীচেকার উপত্যকাতে বা খডে চরিতে গিয়াছে ; সন্ধ্যা হইল, গরু ফিরিয়া আসে নাই, এদিকে বাঘের ভয়। পাহাড়ী মেয়ে একটি পাহাড়ের উপর ঠিক ডগায় যাইল, এক ইঞ্চি যদি আর আগাইয়া যায় তবে হাজার ফুট নীচে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের এমনি অভ্যাস যে, ঠিক পাহাড়ের ডগায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর দুইটি হাত জুড়িয়া মুখের কাছে নিয়া "উ-উ-উ" করিয়া চীৎকার করিল। আওয়াজটা পাহাড়ের খডের নিকট অনেক দূর পর্যন্ত ঢেউ খেলিয়া খেলিয়া চলিল ; তারপর বুঁদি গরুটার বোধ হয় নাম লইয়া ডাকিতে লাগিল। খানিকটা পর দেখি, পাহাড়ের গা দিয়া একটা গরু সিধা উঠিয়া আসিতেছে। ধন্য মানুষ! ধন্য গরু!! এরূপ পাহাড়ের উপর দিয়া উঠা আমাদের নিকট বড়ই নূতন ও আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমরা খানিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া পুনঃ চম্পাবতীর দিকে চলিলাম এবং সন্ধ্যার আগেই পুরানো শিবের মন্দিরে পৌঁছাইলাম।

দেউড়ীর পথে

রাত্রে চম্পাবতীতে আছি, এমন সময় তহশীলদারের লোক আসিয়া বলিল যে, আপনাদিগের চাকর একজন এইখানে রহিয়াছে। আশ্রম হইতে একটি চাকরকে টাকা ও রসিদ দিয়া টনকপুরের স্টেশন হইতে মালপত্র খালাস করিয়া

আনিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাহাড়ী চাকর চম্পাবতী হইতে কয়েক মাইল যাইয়াই অসুস্থ হইয়া পড়ে। এজন্য ভয়ে চম্পাবতীতে আসিয়া লুকাইয়া ছিল। প্রাণেশ সেই চাকরটিকে ডাকাইয়া টাকা ও রসিদ লইল এবং তাহার হাতে আশ্রমে একটি চিঠি লিখিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে পাণ্ডারা আমাদের তিনজনের জন্য খিচুড়ি করিয়াছিল। আমরা আহারান্তে যাত্রা করিলাম এবং ঠাণ্ডা হইতে গরম দেশের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে দেখিলাম, পাহাড়ীরা দল বাঁধিয়া বসিয়া মাদার সেভিয়ারের জন্য শোক করিতেছে। সকলেরই এক কথা যে, তাহাদের অদৃষ্ট মন্দ এজন্য মাদার সেভিয়ার তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অন্নপূর্ণার বাড়ী

এইরূপে সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা দেউড়ীতে আসিলাম। এইস্থানে আসিতে আমাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরকমে পৌঁছাইয়া দেখিলাম যে, ঝরনা নীচুকার পাহাড়ে এবং মুদীর দোকান দূরে উঁচু পাহাড়ে। আমাদের পায়ে ফোস্কা হইয়াছিল এবং পা ফুলিয়া গিয়াছিল, আমাদের আর চলিবার ক্ষমতা নাই। কোনরকমে নীচুকার পাহাড়ে নামিয়া ঝরনার জলে মুখ ধুইলাম, জল পান করিলাম। আমাদের আহারাদির কি হইবে তাহার কোন স্থির করিতে পারিলাম না। এমন সময়

দেখি একজন পাহাড়ী আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। নিকটে দাঁড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া পরিচয় দিল যে, সে বিরজানন্দ স্বামীর ভৃত্য এবং শ্যামলাতলে সে আমাকে রসুই করিয়া খাওয়াইয়াছিল। আমি তো চাঁদ হাতে পাইলাম। প্রাণেশ তাহার হাতে কিছু পয়সা দিল, সে পাহাড়ের উপর মুদীর দোকান হইতে কিছু আহার্যদ্রব্য আনিল। এইরূপে অনিশ্চিত অবস্থাতে আমরা রুটি, ডাল, আলুচচ্চড়ি, দুধ, চা, তামাক ইত্যাদি পাইলাম। ইহাকে বলে অনিশ্চিত ব্যবস্থায় রাজভোগ। আমরা আহ্লাদে খুব শিবের ভজন গাহিতে লাগিলাম, যে, অন্নপূর্ণার বাড়ীতে আসিয়া অনিশ্চিত অবস্থায় রাজভোগ খাইলাম। প্রত্যেকের জন্য পরদিন প্রাতে দুইখানা রুটি ও আলুচচ্চড়ি রাখিতে বলিয়াছিলাম।

জীবন্ত! সমস্তই চৈতন্যময়!!

পরদিন প্রাতে আমরা তিনজনে সুখীডাং-এর দিকে চলিলাম। খানিকটা পাহাড়ে চড়িয়া উতরাই করিয়া নদী পাইলাম। এইস্থানে এই নদীকে 'চলতি' বা 'কালী' বলে, পরে ইহার নাম সরযূ হইয়াছে। আমরা কিনারার বালুর চড়া দিয়া আসিয়া যেখানে জল চলিতেছে, সেখানে আসিয়া পৌঁছাইলাম। স্থানটার নক্সা হইতেছে উঁচু পাহাড়—সামনে পিছনে দুইধারে জলটা গেঁজলা হইয়া পূর্বদিকে উঁচু স্থান হইতে অল্পপরিসরে নীচে নামিয়া আসিতেছে। নীচে আসিয়া

প্রশস্ত হইল ও খানিকটা দক্ষিণ দিকে যাইল। অল্পপরিসর দক্ষিণ দিকে যাইয়া পুনরায় সবেগে অল্পপরিসরে পশ্চিম দিকে চলিল, অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "দ"এর মত দেখিতে হইল। সবদিকেই উঁচু পাহাড় ও জঙ্গল। বেলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্যের রশ্মি পাহাড় টপকাইয়া আসিতে পারিতেছে না।

নদীর যেখানে স্রোত বহিতেছিল, সেখানে পদ্মপাতার মত অনেক পাথর জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরা তো এক একজন এক একখানা ধুইয়া থালা করিলাম—জল চারিদিক দিয়াই চলিতেছে—আমরা রুটি ও আলুচচ্চড়ি মুখে দিই আর এক টুকরা রুটি জলের ভিতর ছোট ছোট মাছকে ফেলিয়া দিই; তাহাতে মাছ পাথরের কাছে আসিয়া কিলবিল করিতে লাগিল। রুটি খাওয়া সমাপন করিয়া আঁজলা করিয়া জল খাইয়া তিনজন দূরেদূরে পাথরে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কি সুরম্য দৃশ্য! কি সুরম্য স্থান!! আমরা তিনজনেই বিভোর হইয়া বসিয়া আছি। মন যেন একেবারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। জীবন্ত! সমস্তই চৈতন্যময়!! নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ। এইরূপে একমনে তিনজনে বিভোর হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় পিছন হইতে এক ডাকপেয়াদা আসিয়া আমাদের বলিল যে, বেলা এগারটা পার হইয়া গিয়াছে। তখন আমাদের চেতনা আসিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে যাইবার উপক্রম করিলাম।

দেখিলাম যে, পাহাড় অতিক্রম করিয়া সূর্যের রশ্মি

অল্পক্ষণ সেইখানে আসিয়াছে। তাহার পর গরম প্রচণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা ধীরে ধীরে অতিকষ্টে বেলা দু'টার সময় সুখীডাং-এ পৌঁছাইলাম। রৌদ্র হইতে শ্রান্তভাবে আসিয়া আমি ও শৈল পেট ভরিয়া জল খাওয়ায় বেহুঁস হইয়া পড়িলাম। পাহাড়ীরা একখানা কম্বল আনিয়া দু'জনের উপর মুড়ি দিয়া গিয়াছিল। কারণ এইখানে বড় মাছির উৎপাত। আমরা সন্ধ্যার আগে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখি যে, পাথর দিয়া উনান করিয়া প্রাণেশ ডাল ভাত বসাইয়া দিয়া, মাদার সেভিয়ারের একখানা ইজিচেয়ার ছিল, তাহাতে শুইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় আমরা মুখ ধুইয়া ডাল ভাত খাইয়া চাঁদের আলোতে ফাঁকা জায়গায় বসিয়া পাহাড়ীদের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। সুমুখের উঁচু পাহাড়, শ্যামলাতল দেখা যাইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে আমরা টনকপুরের দিকে চলিলাম।

টনকপুরের দৃশ্য

পাহাড়ের সীমায় আসিলে দূরে নিম্নদেশে টনকপুর পাহাড় দেখা যাইল। আমি উচ্চ পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া লাঠিটি ভর দিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রশস্ত জঙ্গল... যে দিকে যতদূর চোখ যায়, সব গাছপালা; শুধু সামান্য স্থানে টিনের চাল বলিয়া মনে হইতেছিল, যেন সাদা সাদা

বড়ি দিয়াছে। টনকপুরের বাড়ীসকল দেখিতে এইরূপ হইল এবং একটা ধার দিয়া চকচকে রূপার রেখার মত একটা নদী কোথায় চলিয়া যাইতেছে নদীরও সীমা পাইলাম না। আমি একমনে লাঠিটিতে ভর দিয়া অনেকক্ষণ এই সুরম্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। পুনরায় আর পাইব কি না, এইজন্য এই শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। তারপরে স্থান ও দৃশ্যকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলাম। সবই জীবন্ত! সবই চৈতন্যময়!! সবই যেন শক্তি,—অবয়ব ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সরযূতে তর্পণ

এইরূপে ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিয়া পুনরায় পূর্বতন টনকপুরের জঙ্গল পার হইয়া টনকপুরে পৌঁছাইলাম। বেলা তখন বারোটা পার হইয়া গিয়াছে। একটি পরিচিত পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আমাদের খাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যাহা হউক, রান্না ও থাকিবার দায় হইতে বাঁচিলাম। এই সমতল ভূমির নদীর নাম হইল সরযূ। এইরূপ যোগাযোগ আর হইবে কিনা, এজন্য আমরা তিনজনে সরযূতে স্নান ও তর্পণ করিতে মনস্থ করিলাম। আমাদের সুমুখে নেপালের পাহাড় ও জঙ্গল। প্রথমে সরযূতে স্নান করিলাম। তারপর বড় বড় বাহাদুরী কাঠের উপর বসিয়া তিনজনে তিনস্থানে মন খুলিয়া প্রাণে

যত আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই অনুসারে এই সরযূতে পূজা ও তর্পণ করিতে লাগিলাম। প্রথম কিছু বনফুল ও পাতা পাইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়া যাওয়ায় তারপর অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া পূজা করিতে লাগিলাম। এই পূজা করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল।

সেই আনন্দময় স্মৃতি অদ্যাপি মনে আছে। কারণ এইরূপ যোগাযোগ আর হয় না। মন খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমরা আসিয়া পাহাড়ীর ঘরে আহার করিলাম এবং প্রাণেশ স্টেশন হইতে পূর্ব-কথিক রসিদ দেখাইয়া মালপত্র লইয়া মুটের কাছে জিম্মা করিয়া দিল। তাহারা জিনিসপত্র মায়াবতীর আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

এই স্থানটাকে 'ভাপুর' বলে। আমরা ঠাণ্ডা জায়গা হইতে আসিয়াছিলাম এজন্য এস্থানটাতে বড় গরম বলিয়া বোধ হইল। আমরা আহারাদি করিয়া ট্রেনের কামরার ভিতর শুইয়া রহিলাম। কারণ বাহিরে বড় বাঘের ভয়। পরদিন প্রাতে আমরা ট্রেনে করিয়া পিলিভিতে আসিলাম এবং পিলিভিত হইতে বেরিলী ও মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলাম। এই সময় বেরিলীর কাছে বড় "লু" চলিতেছিল। এইরূপে মায়াবতী দর্শন করিয়া আমরা বৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিন বাস করিলাম।

শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।। ওঁ শান্তিঃ।।।

শিব ওঁ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের
গ্রন্থাবলীর তালিকা।

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

Religion, Philosophy, Psychology etc.

		Rs.	As.	P.
1.	Natural Religion	1	0	0
2.	Energy	1	0	0
3.	Mind	1	0	0
* 4.	Metaphysics			
5.	Reflections on Woman	1	4	0

Art and Architecture

* 1.	Dissertation on Painting			
2.	Principles of Architecture	2	8	0

Literary Criticism and Epic

* 1. Appreciation of Michæl Dutt and Dinabandhu
* 2. Kurukshetra

Social Science

1.	Lectures on Status of Toilers	2	0	0
2.	Homocentric Civilization	1	8	0
* 3.	Status of Women (with Bengali translation)			

		Rs.	As.	P.
4.	Lectures on Education	1	4	0
5.	Federated Asia	4	8	0
6.	National Wealth	5	8	0
7.	Nation (in the press)			
8.	New Asia (in the press)			
9.	Nari-Adhikar (Hindi) (Translation of Status of Women)	0	12	0

অনুধ্যান, দর্শন প্রভৃতি

		মূল্য		
		টা	আ	পা
* ১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান			
* ২।	অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান			
৩।	মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	৪	০
৪।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	০	৮	০
৫।	সাধুচতুষ্টয়	০	১২	০
৬।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২	০	০
* ৭।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড)			
* ৮।	ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)			
৯।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩	০	০

		টা	আ	পা
* ১০।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (তিন খণ্ড)			
১১।	ব্রজধাম দর্শন	১	৮	০
১২।	বদরীনারায়ণের পথে	২	৪	০
১৩।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১	০	০

কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি

* ১।	বৃহন্নলা			
* ২।	উষা ও অনিরুদ্ধ			
৩।	পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫	০	০
৪।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১	৮	০
৫।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার	০	২	
৬।	" (নেপালী অনুবাদ)	০	১	৬

লেখক মহাশয়ের জীবনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ

ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার রচিত "মহিমবাবু"	২	০	০

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের একটি নূতন গ্রন্থ ঃ

Dialectics of Land Economics of India	6	8	0